গবেষণা মনোগ্রাফ সিরিজ সংখ্যা ৩০

BRAC

বস্তিবাসীদের অভিজ্ঞতায় বস্তি উচ্ছেদঃ একটি নিবিড় পর্যবেক্ষণ

মামুন-উর-রশীদ

সার্বিক তত্ত্বাবধানে
শাহাদুজ্জামান

সেপ্টেম্বর ২০০৬

গবেষণা ও মূল্যায়ন বিভাগ, ব্র্যাক
ঢাকা, বাংলাদেশ

বস্তিবাসীদের অভিজ্ঞতায় বস্তি উচ্ছেদঃ একটি নিবিড় পর্যবেক্ষণ

মামুন-উর-রশীদ
ফিল্ড রিসার্চার
গবেষণা ও মূল্যায়ন বিভাগ, ব্র্যাক
mamunbangladesh@gmail.com

সার্বিক তত্ত্বাবধানে
শাহাদুজ্জামান

সহযোগী অধ্যাপক ও সমন্বয়ক
এমপিএইচ প্রোগ্রাম
জেমস পি গ্র্যান্ট স্কুল অব পাবলিক হেলথ, ব্র্যাক বিশ্ববিদ্যালয়
zaman.s@bracuniversity.net

সেপ্টেম্বর ২০০৬

গবেষণা মনোগ্রাফ সিরিজ সংখ্যা ৩০

গবেষণা ও মূল্যায়ন বিভাগ, ব্র্যাক, ৭৫ মহাখালী, ঢাকা ১২১২, বাংলাদেশ
টেলিফোন: (৮৮-০২) ৯৮৮১২৬৫, ৮৮২৪১৮০ (পিএবিএক্স) ফ্যাক্স: (৮৮-০২) ৮৮২৩৫৪২
ই-মেইল: research@brac.net, Website: www.bracresearch.org

সূচিপত্র

Abstract v
Executive summary vi
কৃতজ্ঞতা স্বীকার viii
ভূমিকা ১
বাংলাদেশের বস্তির ইতিহাস ২
প্রকারভেদ ৩
জনকাঠামো ৪
গৃহকাঠামো ৬
পেশা ৭
শিক্ষা ৯
স্বাস্থ্য ৯
সামাজিক পরিবেশ ১০
ক্ষমতা কাঠামো ১০
বস্তি বিষয়ে প্রচলিত ধারণা ও বাস্তবতা ১৩
বস্তিবাসী (নীরব সেবক) ১৫
বস্তি উচ্ছেদ ১৭
গবেষণার উদ্দেশ্য ১৮
গবেষণা পদ্ধতি ১৮
কল্যাণপুর বস্তি ২০
ইতিহাস ২০
উচ্ছেদপূর্ব বাস্তবতা ২৩
বসতি বাস্তবতা ২৪
ক্ষমতা কাঠামো ২৫
এনজিও ও কল্যাণপুর বস্তি ২৮
অপরাধ ৩০
কয়েকজন আলোচিত ব্যক্তি ৩২
উচ্ছেদপর্ব – কল্যাণপুর বস্তি ৩৬
উচ্ছেদ পরবর্তী কল্যাণপুর বস্তি ৪০
বস্তি উচ্ছেদ বিড়ম্বনা ৪০
পেশার উপর প্রভাব ৪১
যৌন ব্যবসার উপর প্রভাব ৪৩
এনজিওদের কার্যক্রমে প্রভাব ৪৪

হতভাগ্য কয়েকজন ৪৬
বস্তিত্যাগ – টিকে থাকার চেষ্টায় ৪৮
বস্তি উচ্ছেদ – বিত্তবানদের প্রেক্ষিতে ৫০
সরকারি জানোয়ার, আমেরিকা বনাম ইরাক ৫২
বস্তিবাসীর সমস্যা – ধনীর সুবিধা – 'পরদেশী' ৫৩
নেতাদের খোলস পাল্টানো ৫৪
বস্তির সংঘর্ষ: পর্যবেক্ষণ বনাম পত্র-পত্রিকার বয়ান ৫৭
দুর্বলের প্রতিরোধ ৬২
গরীবের ভাবনা, প্রেক্ষিত – মসজিদ, বেয়ারা, তোফায়েল ৬৭
বস্তিতে এক রাত ৬৭
উপসংহার ৭১
দুই বছর পর ফিরে দেখা – কল্যাণপুর বস্তি যেন পাথরকুচি পাতা ৭৫
তথ্যপঞ্জী ৭৯

ABSTRACT

This study aimed to explore the social and economic dynamics that led to and followed the eviction of *Kallyanpur basti*, home of some 1,675 families, demolished in December 2003. Information was collected through participant observation, stakeholder perceptions and group discussions. The process of eviction, actual demolition, reactions to the eviction, and eventual settling down of the dwellers are narrated. The initiators of the eviction were the local commissioner and the House Building Research Institute of the government. The demolition was successful in the face of collective protest of the slum dwellers due to the commissioner's collaboration with the leader of the slum dwellers. The dwellers found that there was none to support them in the actual protest. Although they had expected the NGO activists, their local leaders and media to help them out, all of them betrayed. After eviction, some of the dwellers left while others tried to stay. The living conditions were adverse. Cold winter nights without proper housing and sanitation, police raids and internal outbursts of violence led to severe suffering, including death of some children. The *Basti* still exists. The ones who held on to their land through all the troubles have rebuilt their houses. However, the commissioner has retained a large portion of the land. The paper emphasizes the need for collective will and planning on the part of all stakeholders to make sure that future evictions are conducted more effectively, making sure that the sufferings of the dwellers are minimized and they are properly rehabilitated.

EXECUTIVE SUMMARY

Slums emerged as a by product to meet the necessities of urban life. While the needs for which these slum people are crucial to fulfill are appreciated, the inconveniences of having slums in the towns are not. These slums, viewed as centers of crimes, drug dealings and chaos, are the 'disturbance' of city life and, therefore, intolerable. This disliking manifests slum eviction which leave the unskilled workers, rickshawpullers, petty traders and sweeper of cities homeless. During eviction different stakeholders such as the slum dwellers, evictor government or private sector, non-governmental organization (NGO) working in the slums, political parties take different stances. Their respective roles are not always the same and their interests are not static either. Our general wisdom about the slum life and the consequences of slum eviction is limited to the media reports which often, if not entirely, fail to reflect the perspective of the slum dwellers. Therefore, the statements of those who are being evicted needs to be taken into account to have a fuller understanding of the dynamics of slum eviction.

With this objective, the study was conducted at *Kallyanpur* slum during eviction that started on 22 December 2003. Extensive interviews with the slum people were conducted to get into their own perspectives on the whole eviction drive. Participant observation has also proved to be a very useful tool for this purpose. Interviews with the leaders of slum dwellers, government and NGO staff working in slums and people associated with the eviction gave a finer picture of eviction. This paper also have some general discussions on the slum life to make the stories of eviction more complete. The main points of this paper are as follows:

Prevalent idea about slums are that the dwellers are floating residents, they are involved in criminal activities, create social problems such as drugs, pollute city environment and hindrance to development. This sot of mindset generate support for slum eviction. However, they are key ingredients to the rise of cities like Dhaka. The usual claim that they live at slums by illegally occupying the land is a gross mistake since per square feet rent in slums are much higher than the rents prevalent even in posh areas of Dhaka.

Slum evictions never take into account the constitutional rights of the residents and the guidelines in different international treaties or national policies are regularly disregarded. Usual tools of eviction are setting fire to the houses, beating the residents by police force or hired hooligans,

plundering their belongings which all violate human rights putting our conscience at stake.

The Kallayanpur slum was first established by the victims of river erosion from Bhola about 18 years ago. Since then this has regularly been subject to eviction and destruction by fire. However, the residents have managed to reestablish the slum sometimes with help from government and private sector and sometimes by their own efforts. This regularity in rise and fall have created a unique power structure within and around the slum. The political parties have interest in only the votes of the dwellers. People associated with the party in power controls the slum and take 'service charge' for providing 'security' to the dwellers and resolving conflicts.

Though the local political leaders demonstrate their position as a guard to the interest of the slum dwellers, in practice they are agent of evictors. The NGOs operating there fails to take any stance as they are also marginalized by the dominance of slum leaders. Their activity during eviction is limited to preventing their office equipment from plundering.

Eviction not only make the dwellers homeless but also lose their livelihood. Besides the destruction of water and sewerage, the professions like small trading, rickshaw pulling, autorickshaw driving become unstable. In the long-run, they have lesser acceptance since frequent eviction creates instability in their life.

Life after eviction is simply miserable for the evicted though the local city people are happy with improved utility because these are no more supplied to the slum. The evicted people have to spend all that they are left with to find a place to live and become subject to extortion. While the search goes on, sanitation becomes the most crucial problem and specially for the women. In the new place, it is not very easy to find work either. For the lack of education facilities for their kids and in needs of financial services, they feel the absence of the NGOs.

This study demonstrates the general wisdom of eviction and reconstruction. There are lot of things happening in between. The dwellers become united to prevent the eviction. Their efforts of expressing their concern to the prime minister and leader of the opposition unsurprisingly fail. Some letters are also sent to them hoping for some support. Hopelessness force them to believe in fiction of some supernatural saviors.They also take 'weapon of the weak' such as naming dogs by the names of leaders of evictors.

কৃতজ্ঞতা স্বীকার

কল্যাণপুর বস্তির উপর এই গবেষণাটি করতে গিয়ে বস্তিবাসীদের যে সাহায্য ও সহযোগিতা পেয়েছি সে জন্য আমি তাঁদের কাছে বিশেষভাবে ঋণী। ব্র্যাক গবেষণা ও মূল্যায়ন বিভাগের পরিচালক ইমরান মতিন বিভিন্ন সময়ে তার শত ব্যস্ততার মাঝেও আমাকে এই গবেষণা কাজে বিভিন্ন দিকনির্দেশনা দিয়েছেন সেজন্য আমি তাঁকে বিশেষভাবে কৃতজ্ঞতা জানাই। মূল পাণ্ডুলিপি সম্পাদনার ক্ষেত্রে প্রয়োজনীয় সহযোগিতা এবং মূল্যবান উপদেশ দেওয়ার জন্য হাসান শরীফ আহমেদ এবং আলতামাস পাশাকে বিশেষভাবে ধন্যবাদ জানাই। পুরো পাণ্ডুলিপির কম্পোজ ও সংশোধনে মো. আকরাম হোসেনের সহযোগিতা বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। এছাড়া এই গবেষণা কাজটি সুচারুরূপে সম্পাদনে যারা বিশেষভাবে অবদান রেখেছেন তারা হলেন জসিম উদ্দিন, মুন্সি সোলাইমান ও আবু মো. শিহাব।

ভূমিকা

বস্তি নগরায়ণের একটি অপরিহার্য উপসর্গ হিসাবে দেখা দেয়। অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধির ধারাবাহিকতায় উন্নত দেশগুলোতে বস্তির উপস্থিতি কমে গেলেও উন্নয়নশীল দেশগুলোর প্রধান নগরগুলোতে বস্তি এখনও একটি নিরেট বাস্তবতা। প্রেক্ষাপট ভেদে বস্তির সংজ্ঞা বদলে যেতে পারে, তবে বাংলাদেশের গবেষকরা বস্তিকে সংজ্ঞায়িত করতে গিয়ে বলেছেন, "বস্তি হচ্ছে এমন সব এলাকা যেখানে এলাকাভিত্তিক জনবসতির ঘনত্ব অতি উচ্চ। অর্থাৎ প্রতি একরে ৩,০০০ জনের বেশি লোক বাস করে, একটি কামরায় তিনের অধিক প্রাপ্ত বয়স্ক লোক বাস করে। অন্যদিকে বস্তিতে গৃহের নির্মাণ উপকরণের মান খুব নিম্নমানের, পানি সরবরাহ ও পয়ঃনিষ্কাশন ব্যবস্থাও খুব নিম্নমানের, এলাকার ভেতরে চলাচলের পাকা রাস্তা বা পথ খুবই অপর্যাপ্ত বা একেবারেই নেই, আবর্জনা পরিষ্কারের ব্যবস্থা নেই। এখানে দরিদ্র ও অতিদরিদ্র লোক বাস করে এবং তাদের জীবিকা অপ্রাতিষ্ঠানিক বা ইনফরমাল (আহমেদ, আবদাল ১৯৯০)।" "গ্রাম ও শহরের ভূমিহীন পরিবার, মালিকানাবিহীন জায়গায় যে সকল বসতি স্থাপন করে থাকে তাকে আমরা স্বত্বহীন বসতি বা বস্তি বলে আখ্যায়িত করে থাকি (করিম, রফিউল ১৯৯৩)।" অবশ্য শুধু সংজ্ঞা থেকে বস্তির বাস্তব রূপ অনুধাবন সম্ভব নয়। বস্তির বাস্তবতার বহুবিধ জটিল মাত্রা রয়েছে। সাধারণভাবে পত্র-পত্রিকায় প্রায়শই বস্তি একটি আলোচিত বিষয় হয়ে ওঠে প্রধানত বস্তি উচ্ছেদ বা বস্তিতে আগুন লাগা ইত্যাদি ঘটনার প্রেক্ষিতে। যদিও সংবাদপত্রের সীমিত পরিসরে এসব ঘটনার বিস্তারিত বিবরণ বা ব্যাখ্যা পাওয়া দুষ্কর। বস্তি নিয়ে বেশ কিছু গবেষণা হয়েছে, তবে বস্তিবাসীর প্রেক্ষাপট থেকে তাদের জীবনে এসব দুর্যোগের অভিজ্ঞতা এবং প্রভাব সংক্রান্ত গবেষণা দুর্লভ। এই গবেষণায় অংশগ্রহণমূলক পদ্ধতি ব্যবহার করে ঢাকার একটি বস্তি উচ্ছেদের ঘটনাকে বস্তিবাসীদের অভিজ্ঞতার প্রেক্ষিতে বর্ণনা করা হয়েছে। আমরা আশা করি, বস্তি বিষয়ক গবেষণায় এই গবেষণাটি একটি নতুন মাত্রা যোগ করবে। বস্তি উচ্ছেদ প্রসঙ্গে আসবার আগে বস্তি বিষয়ে সাধারণ কিছু আলোচনা যুক্তিযুক্ত হবে বলে মনে করি।

বাংলাদেশে বস্তির ইতিহাস

বাংলাদেশে কবে প্রথম বস্তির উদ্ভব হয়েছিলো সে সম্পর্কে সঠিক তথ্যের অপর্যাপ্ততা রয়েছে। তবে বিভিন্ন উৎস থেকে বস্তির ইতিহাস জানার চেষ্টা থেমে থাকে নি। যেমন – বৃটিশ আমলে এখানে বস্তির উদ্ভব হয়েছিলো বলে মনে করা হয়, কারণ তখন বৃটিশ সরকার বিভিন্ন দুর্ভিক্ষকালীন সময়ে শহরে আসা বুভুক্ষু মানুষের জন্য লঙ্গরখানার ব্যবস্থা করেছিলো আর সেখান থেকেই বস্তির উদ্ভব হয়েছিলো। স্বাধীনতা পরবর্তীকালে এই বস্তির সংখ্যা উল্লেখযোগ্য হারে বৃদ্ধি পায়। বাংলাদেশের স্বাধীনতার আগে তৎকালীন পূর্ব পাকিস্তানে আনুমানিক ৩১১টি বস্তি ছিলো বলে জানা যায়। সত্তর ও আশির দশকে এর সংখ্যা দাঁড়ায় ৭৮১টি এবং আশি ও নব্বই'র দশকে এই সংখ্যা বেড়ে দাঁড়ায় ২,১০০-এর উপরে। ভারত ভাগের সময় ১৯৪৭ সালে বাংলাদেশ ছিল মূলত একটি গ্রাম প্রধান দেশ, তখন মাত্র ৪ শতাংশ লোক শহরে বাস করতো। স্বাধীনতার পর থেকে উল্লেখযোগ্য হারে গ্রাম থেকে শহরে জনসংখ্যার স্থানান্তর ঘটেছে। আনুমানিক হিসাব অনুযায়ী ১৯৭৪ থেকে ১৯৮২-এর মধ্যবর্তী সময়ে শহরে প্রতি বছর শতকরা ১০.৬ ভাগ হারে জনসংখ্যা বেড়েছে। এর ফলে গ্রামীণ জনসংখ্যা বর্তমানে ৮০ শতাংশে দাঁড়িয়েছে। ষাটের দশকে গ্রামীণ জনসংখ্যা প্রবৃদ্ধির হার ছিলো বাৎসরিক ২.৪ শতাংশ। স্বাধীনতা উত্তর সময়ে তা কমে দাঁড়িয়েছে বাৎসরিক ১.৩ শতাংশ। দিশেহারা মানুষ বিশাল শহরের পথে ঘুরেঘুরে একসময় যেখানেই একখণ্ড জায়গা খুঁজে পেয়েছে সেখানেই এক ধরনের খুপরি বানিয়ে বসবাস শুরু করেছে আর এভাবেই উৎপত্তি হয়েছে বস্তির (রশিদুজ্জামান ১৯৯৭)।

ঢাকায় বৃটিশ আমলেও বস্তি ছিলো, তবে সংখ্যায় খুব কম ছিলো। খ্যাতনামা টাউন প্ল্যানার পেট্রিক গেডিসের রিপোর্টে ১৮০০ সালে ঢাকায় বস্তির কথা উল্লেখ আছে। বিগত ২০/২৫ বছরে ঢাকাতে বস্তির সংখ্যা ব্যাপক আকারে বৃদ্ধি পেয়েছে। প্রথম অবস্থায় পুরোনো ঢাকার শাঁখারী বাজার, ঠাটারি বাজার, যোগীনগর ইত্যাদি এলাকায় শুধুমাত্র বস্তি ছিলো। ষাটের দশকে পরপর দুইটি বড় বন্যায় ব্যাপক খাদ্যাভাব দেখা যায়। ফলে খাদ্যের সন্ধানে মানুষ শহরের দিকে পা বাড়ায় এবং বৃদ্ধি পেতে থাকে বস্তির সংখ্যা। স্বাধীনতা যুদ্ধের আগে রেল লাইন এলাকায় বস্তি ছিলো বেশি, কিন্তু যুদ্ধের সময় পাকিস্তানী সৈন্যরা এসব বস্তি জ্বালিয়ে দেয়। ১৯৭২ সালে দেশ স্বাধীন হবার পর গ্রাম এলাকায় তীব্র খাদ্যাভাব দেখা দেয়। এই অভাব হাজার হাজার মানুষকে শহরের দিকে ঠেলে দেয়। আবার ১৯৭৪-এর দুর্ভিক্ষের সময়ও বিপুল সংখ্যায় মানুষ গ্রাম থেকে শহরের দিকে ধাবমান হয়। তাদের সবারই ধারণা ছিল যে শহরে গেলে একটা না একটা কাজ পাওয়া যাবে, না খেয়ে মরতে হবে না – এর ফলাফল হলো বস্তির সংখ্যা তথা বস্তিবাসীর সংখ্যা বৃদ্ধি পাওয়া (আহমেদ, আবদাল ১৯৯০)।

এভাবেই সময়ের পরিক্রমায় বস্তির উদ্ভব ও সংখ্যা বৃদ্ধি পায়। এক্ষেত্রে সাপ্তাহিক বিচিত্রা, মার্চ ১৯৯০ সংখ্যায় প্রকাশিত একটি জরিপে দেখা যায়, রাজধানীর ১,১২৫টি বস্তির মধ্যে শতকরা ৩৮ ভাগ গড়ে উঠেছে গত আট বছরে, শতকরা ৭৬ ভাগ বস্তি গড়ে উঠেছে বিগত ১৯ বছরে, এবং ২০ বছরের চেয়ে পুরোনো বস্তির সংখ্যা মাত্র ২০ শতাংশ বেড়েছে। তবে দুই দশক ধরে গড়ে ওঠা এসব বস্তির গঠন প্রকৃতিতে রয়েছে উল্লেখযোগ্য ধরনের ভিন্নতা।

প্রকারভেদ

এই গবেষণার জন্য যেহেতু ঢাকার কল্যাণপুর বস্তি বেছে নেওয়া হয়েছিলো, সেহেতু গবেষণার মূলদৃষ্টি ঢাকার বস্তির উপর দেয়া হয়েছে। ঢাকা শহরের মোট বস্তির সংখ্যা নিয়ে হয়ত পরিসংখ্যানগত ভিন্নতা রয়েছে কিন্তু এই ভিন্নতা নিতান্তই সময় এবং লোকবলের কারণে ঘটেছে বলে ধারণা করা হয়। ঢাকা শহরের বস্তিগুলোকে দু'ভাগে ভাগ করা হয়: (১) অবৈধ (২) বৈধ। সাপ্তাহিক বিচিত্রায় প্রকাশিত একটি জরিপ থেকে দেখা যায়, ঢাকার ৩৫ ভাগ বস্তি অবৈধ এবং বাদবাকী ৬৫ ভাগ বৈধ। এই দু'শ্রেণীর বস্তি সম্পর্কে বোঝার জন্য নিচের তথ্যগুলো গুরুত্বপূর্ণ।

অবৈধ বস্তিগুলো সাধারণত পৌর কর্পোরেশন, রাজউক, বিশ্ববিদ্যালয়সহ বিভিন্ন সরকারি, আধা-সরকারি প্রতিষ্ঠানের পতিত বা অব্যবহৃত জায়গায় গড়ে উঠেছে। এগুলোর স্থায়ী কোন ভিত্তি নেই। উচ্ছেদের সময় সরকারি বাহিনী এবং মাস্তান দ্বারা সাধারণত বস্তিবাসীরা নির্যাতিত হন। এই বস্তি গুলোতে হয়ত ঘরভাড়া দিতে হয় না কিন্তু প্রতিনিয়ত চাঁদা দিতে হয়, না দিলে হুমকির মুখোমুখি হতে হয় বস্তিবাসী মানুষকে। অনেক সময় এলাকার প্রভাবশালী লোকদের পারিবারিক দ্বন্দ্ব বা ব্যক্তিগত কলহের নির্মম শিকারে পরিণত হয় এইসব বস্তি।

বৈধ বস্তিগুলো সাধারণত ব্যক্তি বা পারিবারিক মালিকানায় প্রতিষ্ঠিত ও পরিচালিত। Coalition for the Urban Poor-এর হিসাব অনুযায়ী ওয়ার্ডভিত্তিক বা গোষ্ঠী মালিকানাধীন এরকম বস্তির সংখ্যা ঢাকা শহরে ৭৩৩ এর উপরে। সম্পূর্ণ ব্যবসার উদ্দেশ্যে বাঁশ, পাটখড়ি, ছন ও পলেথিনের তৈরি এক কামরার একটি বস্তির ঘরের জন্য ভাড়া গুণতে হয় মাসে ২০০ থেকে ৫০০ টাকা। নিকৃষ্টমানের আবাসিক সুবিধা সম্পন্ন বস্তিগুলোর প্রায় সবগুলোতেই গ্যাস, পানি, বিদ্যুৎসহ জীবনধারনের জন্য প্রয়োজনীয় সুবিধা নেই বললেই চলে। Coalition for the Urban Poor-এর ১৯৮৮ সালের জরিপ অনুযায়ী এই বস্তির মাত্র ১০ ভাগ ঘরবাড়ি পাকা কিংবা আধাপাকা, আর পরিসংখ্যান ব্যুরোর মতে এর সংখ্যা ১.৯৮ শতাংশ। বাদবাকী সবই কাঁচা উপকরণ দিয়ে তৈরি। এসব ঝুপড়িতে প্রবেশ পথ মাত্র একটি। এবং এটি এত সংকীর্ণ যে অনেক ঝুপড়িতেই হামাগুড়ি দিয়ে ঢুকতে হয়। হাড়-কাঁপানো শীত কিংবা গ্রীষ্মের প্রচণ্ড দাবদাহের যে নির্মমতা তার মোকাবেলা এই বস্তিবাসীরা কোন রকমে করতে পারলেও বর্ষায় এরা ভীষণ অসহায় হয়ে পড়ে। শীতকে বর্জ্য পোড়ানো আগুন বা ছেঁড়া কাঁথায় রোখা যায়, গরমে আশ্রয় নেওয়া যায় গাছ তলায় কিন্তু বর্ষার পানিতে বা শহরের জলাবদ্ধতা ও বন্যায় টিকে থাকতে প্রচণ্ড কষ্ট করতে হয় এদেরকে। সারণী ১ থেকে ঢাকার বস্তিগুলোর মালিকানার ধরণ সম্পর্কে স্বচ্ছ ধারণা লাভ করা যাবে।

সারণী ১. ঢাকার বস্তির মালিকানার ধরণ

মালিকানার ধরণ	বস্তির সংখ্যা	শতকরা হার
সরকারি/আধাসরকারি	৩২৮	২৯.২
ব্যক্তিমালিকানাধীন (সংস্থা)	২৩	২.০
ব্যক্তিমালিকানাধীন (নিজস্ব)	৭৩৩	৬৫.১
মিশ্র (সরকারি/নিজস্ব)	১১	১.০
শনাক্ত করা সম্ভব হয়নি	৩০	২.৭
মোট	১১২৫	১০০.০

উৎস: নগর গবেষণা কেন্দ্র, স্লামস এন্ড স্কোয়াটার্স ইন ঢাকা ১৯৮৮

বলাবাহুল্য বাংলাদেশের রাজধানী ঢাকাতেই যে শুধু বস্তি রয়েছে তা নয়, বস্তি আছে অন্যান্য জেলাশহরগুলোতেও (সারণী ২)।

সারণী ২. বস্তি ও বস্তিবাসীর সংখ্যা

মহানগর	থানা	বস্তির সংখ্যা	পরিবারের সংখ্যা	লোকসংখ্যা
ঢাকা	১৫	৫০২	৫৯,১৯১	৩৭১৯৮১
চট্টগ্রাম	৬	৭৪	২৫,২৮০	১৬৪১৩৫
খুলনা	৪	৬৯	১৯,৯৫২	১১৬১৯৫
	২৫	৬৪৫	১০৪,৪২৩	৬,৫৩০৭১

আবদাল আহমেদ ১৯৯০-এ দেখিয়েছেন, নগরে জনসংখ্যা বৃদ্ধির হার ২০০০ সালে ৪.৮ শতাংশ, ২০১০ সালে ৪ শতাংশ, ২০১৫ সালে ৩ শতাংশ হবে। এভাবে কমতে থাকলেও আগামী বছরগুলোতে বাংলাদেশের নগরায়ণের মাত্রা ও জনসংখ্যার পরিমাণ যথেষ্ট বাড়বে। অর্থাৎ হিসাব করলে দেখা যায় ২০১০ সালে নগরায়ণের হার হবে ৩৩ শতাংশ এবং মোট জনসংখ্যা হবে ৫ কোটি ৭০ লাখ। এখানে আরও উল্লেখ করা হয়েছে শহরমুখী জনসংখ্যার ৩২ ভাগ ঢাকামুখী এবং গত দু'দশকে ঢাকা শহরের জনসংখ্যা বৃদ্ধি পেয়েছে অত্যন্ত দ্রুতহারে যা প্রায় ৮ থেকে ১০ শতাংশ। এই হারে বাড়তে থাকলে ঢাকার জনসংখ্যা ২০১০ সালে দেড় কোটি হবার কথা। দেখা গেছে, ঢাকার ৬০ শতাংশ লোকের জন্ম এই শহরের বাইরে এবং ৪০ শতাংশ লোক বস্তি ও বাস্তুহারা এলাকার অধিবাসী। প্রতিমা পাল মজুমদার (১৯৯০) তার একটি গবেষণায় উল্লেখ করেছেন, নগর এলাকার বস্তিগুলোতে যারা বসবাস করেন তাদের ৯৩ শতাংশ অভিবাসী এবং এদের ৭৪ শতাংশ দরিদ্রতাজনিত কোন না কোন কারণে শহরে এসেছে। সমাজকল্যাণ ও গবেষণা ইনস্টিটিউট কর্তৃক পরিচালিত একটি গবেষণায় উল্লেখ করা হয়েছে, গ্রামীণ জীবনের গরিবি হাল এবং প্রাকৃতিক দুর্যোগ, গ্রামীণ দরিদ্রদের নগর এলাকায় স্থানান্তর করতে উৎসাহিত করেছে। বেশিরভাগ উত্তরদাতা শহরে এসেছে ভাগ্যের উপর নির্ভর করে এবং ঠিকানাবিহীন অবস্থায় তারা বস্তির জীবন শুরু করেছে। যেসব বৈশিষ্ট্যের উপর নির্ভর করে তারা নগরে বসবাস শুরু করেছে তার অন্যতম হলো, কর্মসংস্থানের সুযোগ। বিভিন্ন গবেষণায় দেখা গেছে শহরের সোনার হরিণের (কর্মসংস্থানের) খোঁজে এসে লোকজনের ঠাঁই হচ্ছে বস্তিতে। আবার দরিদ্র শ্রেণীর নগরমুখী অভিবাসন pull factor (নিশ্চিত কর্মসংস্থান, নিরাপদ জীবনসহ অন্যান্য কারণে শহরের দিকে টেনে আনার প্রবণতা) ও push factor (অভাব, নিরাপত্তাহীনতা, কর্মসংস্থানের অভাবসহ অন্যান্য কারণে গ্রাম থেকে শহরে ঠেলে দেওয়ার প্রবণতা) এই দু'টি প্রক্রিয়ার মাধ্যমে হচ্ছে। তবে pull factor-এর চেয়ে push factor ই এখানে অধিক সক্রিয়। অর্থাৎ গ্রামীণ জনগণ নগরমুখী হচ্ছে কিন্তু নগরের জনগণ গ্রামমুখী হচ্ছে না। এর তাৎপর্য হলো, নগর এলাকায় দারিদ্র্য ও কর্মসংস্থান দুটোই রয়েছে। কিন্তু কর্মসংস্থানের সুযোগকে অদক্ষ জনগোষ্ঠী সঠিকভাবে প্রয়োগ করতে অপরাগ হওয়ায় কম মজুরি পেয়ে গরিবই থেকে যাচ্ছে। সুতরাং নগর ও গ্রাম উভয় ক্ষেত্রে দরিদ্র্যতা থাকা সত্ত্বেও নগর এলাকায় গ্রামীণ দরিদ্ররা আসছে এবং নগর এলাকায় স্থিতিলাভ করছে (ইসলাম, মো. নুরুল এবং ইসলাম, মো. শরিফুল ১৯৯৬-৯৭)।

বস্তিবাসী জনগোষ্ঠীর উৎস, অভিবাসনের কারণ, এবং তাদের জীবনযাত্রা নিয়ে বিভিন্ন সময়ে নানামুখী গবেষণা হয়েছে। অর্থনৈতিক সংস্কারের অভিজ্ঞতা সম্পর্কে বাংলাদেশ উন্নয়ন পর্যালোচনা ১৯৯৫ নামক পুস্তকে উল্লেখ করা হয়েছে – (১) গ্রামাঞ্চলে (যেখানে দেশের অধিকাংশ দরিদ্র লোক বাস করে) ১৯৮৫-৮৬ সাল থেকে দরিদ্রতা ক্রমাগত বৃদ্ধি পেয়েছে। দৃশ্যত আশির দশকের গোড়ার দিকে গ্রামীণ দরিদ্র অবস্থার যে উন্নতি লক্ষ্য করা যাচ্ছিল তা আশির দশকের শেষের দিকে অব্যাহত থাকে নি। (২) অন্যান্য উন্নয়নশীল দেশের মত বাংলাদেশেও মূলত গ্রামাঞ্চলেই দারিদ্র্যের অভিঘাত ও তীব্রতা বিশেষভাবে লক্ষণীয়। (৩) প্রাপ্ত উপাত্তের ভিত্তিতে এটাও স্পষ্ট যে, আশির দশকের মধ্যভাগ থেকে গ্রামাঞ্চলের সবচাইতে গরিব অংশের জনগণের জীবনযাত্রার মান ক্রমাগত হ্রাস পাচ্ছে আর এই দরিদ্রতাসহ অন্যান্য জটিলতা মোকাবিলা করার জন্য লোকজন শহরমুখী হয়েছে এবং অনিবার্য কারণে এদের ঠাঁই হয়েছে বস্তিতে।

সরকারের পরিসংখ্যান বিভাগের উপাত্ত অনুযায়ী কৃষিখাতে প্রকৃত মজুরি ১৯৮১-৮২ থেকে ১৯৯৩-৯৪ সময়পর্বে হ্রাস পেয়েছে। প্রকৃতপক্ষে ১৯৯১-এর পর থেকে এই হ্রাসের গতি আরও দ্রুত হয়েছে। কৃষি পরিসংখ্যান শাখার উপাত্ত অনুযায়ী কৃষির প্রকৃত মজুরি ১৯৮৫-৮৬ সালের দিনপ্রতি ২১.১৯ টাকা থেকে হ্রাস পেয়ে ১৯৯১ সালে প্রতিদিন ১৯.১৭ টাকায় দাঁড়িয়েছে। অন্যদিকে BIDS-এর হিসাব মতে ১৯৯১-৯২ সাল নাগাদ কৃষিমজুরি দিনপ্রতি ১৬.৭৭ টাকায় হ্রাস পেয়েছে। এ থেকে প্রতীয়মান হয় যে, দিন দিন মজুরি হ্রাসের ফলে গ্রামীণ কৃষক শ্রেণী তাদের ন্যূনতম মৌলিক চাহিদা পূরণে ব্যর্থ হচ্ছে তাই ভাল থাকার আশায়, খেয়ে পরে বেঁচে থাকার আশায় চলে আসে শহরে। একথা ব্যাখ্যা করার প্রয়োজন নেই যে এরা শহরে নতুন পরিস্থিতে খাপ-খাওয়ানোর অংশ হিসাবে বস্তিতে বসবাস করতে থাকে। অবশ্য একথাও ঠিক যে, এই শহরে আসা জনগোষ্ঠীর হার বাংলাদেশের সব অঞ্চলের জন্য সমান নয়। গণসাহায্য সংস্থার (রশিদুজ্জামান ১৯৯৭) একটি জরিপ থেকে দেখা গেছে, বস্তিবাসীদের ২০.৮ ভাগ লোক ফরিদপুর, ১৯.৮ ভাগ লোক বৃহত্তর ঢাকা, ৭.১৬ ভাগ লোক ময়মনসিংহ, ২.৯ ভাগ লোক জামালপুর, ১.৪ ভাগ লোক টাঙ্গাইল, ১৫.৫ ভাগ লোক কুমিল্লা, ৩.৩ ভাগ লোক নোয়াখালী, ০.৭ ভাগ সিলেট, ০.৬ ভাগ চট্টগ্রাম, ০.১ ভাগ পার্বত্য চট্টগ্রাম, ২.১ ভাগ রংপুর, ০.৪ ভাগ রাজশাহী, ০.১ ভাগ পাবনা, ০.৫ ভাগ দিনাজপুর, ০.২ ভাগ বগুড়া, ১৮.৫ ভাগ বরিশাল, ১.৯ ভাগ পটুয়াখালী, ১.২ ভাগ খুলনা, ০.৫ ভাগ যশোর, ০.৩৫ ভাগ কুষ্টিয়া থেকে ঢাকা শহরে অভিবাসিত হয়েছে (সারণী ৩)।

পরিচালিত জরিপ থেকে দেখা গেছে গ্রামের দরিদ্র লোকজন নিচের কারণগুলোর জন্য বস্তিতে অভিবাসিত হয়েছে –

(১) উপর্যুপরি প্রাকৃতিক দুর্যোগ
(২) ভূমিহীনে পরিণত হওয়া
(৩) বেকারত্ব
(৪) অধিক আয়ের আশায়
(৫) কৃষিক্ষেত্রের বিভিন্ন উপকরণ যেমন, সার কীটনাশক ইত্যাদির উপর ভর্তুকি প্রত্যাহারের ফলে আয় হ্রাস এবং এর ফলশ্রুতিতে জীবনযাত্রার মানের অবনতি

সারণী ৩. বস্তিবাসীদের আদি বাসস্থান

প্রারম্ভিক জেলা	বস্তিবাসী পরিবার প্রধানদের জেলাওয়ারী বিভাজন	
(বৃহত্তর জেলা)	*ঢাকা নগরীর বস্তিসমূহ	**সমগ্র বাংলাদেশ
ঢাকা	১৮.৩	১৮.৫
নোয়াখালী	১০.৬	৩.৬
চট্টগ্রাম	-	১.১
কুমিল্লা	১৩.৭	১৬.১
ফরিদপুর	২০.২	২০.০
জামালপুর	১.৩	২.৭
ময়মনসিংহ	২.৪	৬.৭
টাঙ্গাইল	২.০	-
রংপুর	-	২.০
বরিশাল	২০.৮	১৮.৬
পাবনা	৩.২	১.০
অন্যান্য	৮.৭	৯.৯
সংখ্যা	৪৯,৯৯৫	১১,৩৮৯

* ঢাকা মহানগরী বস্তি, সমস্যা নিরসন কমিটির রিপোর্ট সেপ্টেম্বর ১৯৮৯

** Urban Poor in Bangladesh, Vol. 1, Comprehensive Summary Report, April 1990

রশিদুজ্জামান (১৯৯৭) তাঁর একটি প্রবন্ধে উপরের তথ্যের সাথে আরো দেখিয়েছেন, "জরিপ বিশ্লেষণ করে দেখা গেছে, ২০ শতাংশ লোক নদী ভাঙ্গার কারণে পরিবারসহ শহরে চলে এসেছে। ৪৯ ভাগ এসেছে কাজের খোঁজে, ২৯ ভাগ এসেছে ভূমিহীন হয়ে। অন্যদিকে নানা ধরনের সামাজিক সমস্যা থেকে মুক্তি পেতে মোট নারীদের ৪ শতাংশ গ্রাম ছেড়ে শহরে এসেছে।" রশিদুজ্জামান (১৯৯৭) তাঁর আরো একটি নিবন্ধে গ্রাম ও শহরের দারিদ্র্য পীড়িত জনসংখ্যার হারের যে প্রভেদ দেখিয়েছেন তা থেকে দেখা যায়, সত্তর-এর তুলনায় আশির দশকে লোকজন বেশি শহরে স্থানান্তর করেছিলো। তিনি দেখিয়েছেন যে, ১৯৮৩-৮৪ সালে গ্রাম ও শহর এলাকায় মাথাপিছু আয় এক থাকলেও গ্রাম এলাকায় দারিদ্র্যসীমার নিচে বসবাসকারী লোকজন বেশি ছিল। বিশ্লেষণ থেকে দেখা যায়, গ্রামীণ জনগণের মাথাপিছু আয় শহরের জনগণের তুলনায় অনেক কম। অন্যদিকে গ্রামীণ লোকদের মধ্যে দারিদ্র্যের মাত্রা বেশি। আবার প্রছন্ন বেকারত্ব (চারজনই যেখানে একটি কাজ করার জন্য যথেষ্ট, কিন্তু শ্রমের সহজলভ্যতা এবং কাজের ক্ষেত্র না থাকায় ছয় জন মিলে ঐ একই কাজ করে মজুরি ভাগ করে নেওয়া) নামে একধরণের বেকারত্ব পাওয়া যায়, যা শুধু গ্রামীণ অর্থনীতিতেই বেশি পাওয়া যায় – ফলে গ্রামের লোকজন শহরমুখী হয়েছে এবং বস্তিতে অবস্থান করেছে।

গৃহকাঠামো

Coalition for the Urban Poor-এর ১৯৮৮ সালের গবেষণায় লক্ষ্য করা যায়, বস্তিবাসীদের মাত্র ১০ শতাংশ ঘর পাকা কিংবা আধাপাকা আর বাদবাকি সব ঘরবাড়ি কাঁচা উপকরণে তৈরি। এসব উপাদানের মধ্যে বেশিরভাগই বাঁশ, চাটাই এবং পলিথিনের। এটা সহজেই অনুমেয় যে, বস্তিতে নাগরিক সুবিধাদির পরিমাণ খুবই অপ্রতুল (সারণী ৪)। আবর্জনা নিষ্কাশনের কোন ব্যবস্থাই না থাকার কারণে বস্তির পরিবেশ খুবই অস্বাস্থ্যকর। ঢাকা মহানগরীর মাত্র ৮.৬ শতাংশ বস্তিতে আবর্জনা নিয়মিত

অপসারণের ব্যবস্থা আছে। অস্বাস্থ্যকর পরিবেশে বাস করে তারা নিয়মিতভাবে অসুস্থ হয়ে পড়লেও, কেবলমাত্র ৩.৪ শতাংশ বস্তিতে রয়েছে চিকিৎসা সেবা পাবার সুযোগ।

সারণী ৪. বস্তিতে নাগরিক সুবিধাদি

সুযোগসুবিধাদি	বস্তির সংখ্যা	১১২৫টি বস্তির শতাংশ
গ্যাস	৩৪১	৩০.৩
বিদ্যুৎ	৬২৭	৫৫.৭
পানি (ওয়াসা)	৫৩৬	৫০.০
আবর্জনা নিষ্কাশন	৯৭	৮.৬
গোসলের জায়গা	৫৭৫	৫১.১
টিউবয়েল	১৬৪	১৪.৬
গণ শৌচাগার	৯৭৪	৮৬.৮
মসজিদ	১১৬	১০.৩
প্রাথমিক বিদ্যালয়	৬৪	৫.৭
উন্মুক্তস্থান	১১৫	১০.২
বিভিন্ন প্রকার দোকান	২৯৬	২৬.৩
স্বাস্থ্যকেন্দ্র	৩৮	৩.৪

উৎস: নগর গবেষণা কেন্দ্র, স্লামস এন্ড স্কোয়াটার্স ইন ঢাকা ১৯৮৮

গ্যাস, পানি ও শৌচাগারের সুবিধা যদিও সন্তোষজনক বলে মনে হয়, কিন্তু বাস্তবতা হচ্ছে এগুলোর ব্যবস্থাপনা ও রক্ষণাবেক্ষণে রয়েছে চরম অব্যবস্থা।

পেশা

রশিদুজ্জামান (১৯৯৭) বস্তিবাসীদের পেশার পরিচয় দিতে গিয়ে বলেছেন, "সাধারণভাবে পুরুষদের একটা ব্যাপক অংশ রিকশাচালক" (সারণী ৫)। তাছাড়া রয়েছে বিভিন্ন পরিবহণের চালক ও মেরামতকারী, এবং এর সাথে সম্পৃক্ত রিকশা মালিক। পুরুষ ও কিশোরদের একাংশ বাস, কোচ, বেবি, টেম্পু, ট্রাক ও মিশুক চালক এবং বিভিন্ন ক্ষুদ্র শিল্পের শ্রমিক, গার্মেন্টস শিল্পের শ্রমিক, দোকানের কর্মচারী, ঘরে ঘরে ফেরি করাসহ বিভিন্ন ছোট ব্যবসায় নিযুক্ত ব্যক্তি, নির্মাণ শ্রমিক ও দিনমজুর। এ ছাড়াও নিম্ন বেতনের বিরাট সংখ্যক সরকারি, আধা-সরকারি, প্রাইভেট অফিস আদালতে নিযুক্ত চাকুরিজীবী এসব বস্তিতে বসবাস করে। মেয়েদের একটা ব্যাপক অংশ গার্মেন্টস শ্রমিক, রাঁধুনি, খণ্ডকালীন বা পূর্ণকালীন গৃহপরিচালিকা, আয়া, ঝি, মালি ইত্যাদি। তাছাড়া মুচি, স্বর্ণকার, জেলে, কৃষিশ্রমিক, টেনারী শ্রমিকসহ কিছু যৌন ব্যবসায়ী বস্তিতে রয়েছে। সারণী ৪ থেকে এটাও খুব স্পষ্টভাবে বোঝা যায় যে, মহিলারা তাদের আয়মূলক কাজ হতে পুরুষদের চেয়ে অনেক কম অর্থ উপার্জন করে।

সারণী ৫. বস্তিবাসীদের পেশা

বিভিন্ন বস্তি এলাকায় মহিলারা যেসকল পেশায় নিয়োজিত তাদের পেশা ও আয়ের বিন্যাস				বিভিন্ন বস্তি এলাকায় পুরুষরা যেসকল পেশায় নিয়োজিত তাদের পেশা ও আয়ের ভিত্তিতে বিন্যাস			
পেশার নাম	সংখ্যা	হার (%)	মাসিক গড় আয় (টাকা)	পেশার নাম	সংখ্যা	হার (%)	মাসিক গড় আয় (টাকা)
গৃহিণী	৪০	২২.৯৬	-	রিকসা ভ্যান	৮৯	৪৪.৫০	২৬৫০
বাসার কাজে সাহায্যকারী	৩৯	২২.৪৬	৬০০	দিনমজুর	৩৮	১৯.২৩	২৫০০
ক্ষুদ্র ব্যবসা	২৮	১৫.৮৮	১৫০০	ক্ষুদ্র ব্যবসা	১৭	৮.২৪	২৪০০
গার্মেন্টেসে চাকুরি	১৯	১০.৬১	১০০০	সরকারি, বেসরকারি চাকুরি	৮	৩.৭৪	২৬০০
ফেরিব্যবসা	১৫	৮.২৩	১৬০০	ড্রাইভার/পরিবহণ শ্রমিক	১৪	২.৭৪	২৩০০
সরকারি, বেসরকারি চাকুরি	৪	১.৯২	২০০০	নির্মাণ শ্রমিক	৬	২.৭৪	২৩০০
-	-	-	-	ফেরিব্যবসা	৩	১.৬৮	২২৫০
অন্যান্য	৩০	১৭.২৩	১৫০০	অন্যান্য	২৫	১২.৭৩	২০৫০
সর্বমোট	১৭৫	১০০	১১৭১	সর্বমোট	২০০	১০০	২০৩১

সূত্রঃ Coalition for the urban poor (CUP)1997

তবে বিভিন্ন কাজ হতে প্রাপ্ত আয় দ্বারা কাজগুলোর মধ্যে তুলনামূলক পর্যালোচনা ত্রুটিপূর্ণ হবে। কারণ, বিভিন্ন কাজের জন্য কর্মীরা একই পরিমাণ সময় ব্যয় করে না। বিভিন্ন কাজ হতে কর্মীরা ঘন্টা প্রতি যে পরিমাণ অর্থ উপার্জন করে, তা থেকে কাজগুলোর মধ্যে কোনটি অধিক আকর্ষণীয় তা বোঝা যেতে পারে। সারণী ৬ এ বস্তিবাসীদের (১০ বছরের ঊর্ধ্বে) পেশা কাঠামো অনুযায়ী শ্রমঘন্টা ও আয়ের পরিমাণ দেখানো হয়েছে।

সারণী ৬. শ্রমঘন্টা ও আয়ের পরিমাণ

পেশা	শতকরা অংশ (৪৮৫ শতাংশ)	দৈনিক নিয়োজিত শ্রমঘন্টা (টাকায়)	দৈনিক মজুরি (টাকায়)	ঘন্টা প্রতি গড় মজুরি
পরিবহণ শ্রমিক	৩০.৪	৮.৫	৫১.২	৬.০
ক্ষুদ্র ব্যবসায়ী	১৭.২	৮.৭	৪৫.৩	৫.২
দিনমজুর(দক্ষ/অদক্ষ)	১৩.৪	৫৫.০	৯.৫	৫.৮
চাকুরিজীবী	১৩.৫	৮.১	৬১.৪	৭.৬
কারখানা শ্রমিক	৯.৬	৮.৭	২৯.৮	৩.৪
বাসার কাজে সাহায্যকারী	১০.৫	৭.৮	৭.২	০.৯২
সবপেশা	১০০	৮.৮	৪৬.০	৪.৮

সূত্রঃ প্রতিমা পাল মজুমদার, নগর দরিদ্রঃ সমস্যার প্রকৃতি ও ব্যাপকতা (অরণী প্রকাশনী ঢাকা ১৯৯২, পৃষ্ঠা-১৮)

গ্রাম থেকে লোকজনের বস্তিতে স্থানান্তরের ফলে তাদের পেশাগত ক্ষেত্রে আমূল পরিবর্তন ঘটে। গ্রামীণ পেশাসমূহের অধিকাংশ নগরকাঠামো উপযোগী না হওয়ায় সম্পূর্ণ নতুন পেশায় তারা যুক্ত হয়।

জরিপ থেকে জানা যায়, বস্তিবাসীদের ৩৫ শতাংশের আদি পেশা ছিল চাষাবাদ, এছাড়াও জেলে, তাঁতি, কামার, কুমার ইত্যাদি পেশার মানুষরাও নগরে আসছেন (সারণী ৭)। শহরে এসে তাদের মধ্যে একটি বড় অংশই রিকশা ও ভ্যান চালানোকে প্রধান পেশা হিসাবে নেয়। অভিবাসনের পূর্ব ও পরবর্তী উভয় সময়ে কেবল গৃহকর্মকেই অন্যতম পেশার তালিকায় পাওয়া যায়। এখানে লক্ষ্যণীয় যে, গৃহকর্ম হতে প্রাপ্ত আয় খুবই কম হয়ে থাকে।

সারণী ৭. অভিবাসনের পূর্ব ও বর্তমান পেশার চিত্র

গ্রামে থাকাকালীন পেশা	শতাংশ	বস্তিবাসী হওয়ার পর বর্তমান পেশা	শতাংশ
চাষাবাদ	৩৫	রিকসা/ভ্যান চালনা	২৯
গৃহকর্ম	২৫	গৃহকর্ম	১৬
জেলে, মাঝি, কামার, কুমার, তাঁতি	১২	ক্ষুদ্রব্যবসা	১৪
বেকার	৬	দিনমজুর	১০.৭
শৈশবেই গ্রাম ছাড়া	১৪	অন্যের গৃহকর্ম, ঠেলা চালানো, যান চালানো, চাকরি, অন্যান্য পেশা, বেকার, ভিক্ষুক, শিশু শ্রমিক	৮

উৎস: নগর গবেষণা কেন্দ্র, স্লামস এন্ড স্কোয়াটার্স ইন ঢাকা ১৯৮৮

শিক্ষা

একইভাবে এদের শিক্ষা ব্যবস্থার হালও করুণ। পরিকল্পনা কমিশন ও এশীয় উন্নয়ন ব্যাংকের (ADB) নগর দরিদ্র জরিপ ১৯৯৬ অনুযায়ী ৬ থেকে ১৪ বছর বয়সী ৫৭ শতাংশ ছেলেমেয়ে স্কুলে যায় এবং অবশিষ্ট ৪৩ শতাংশ স্কুলে যায় না। এদের অন্যতম শিক্ষা সমস্যা হলো স্কুল ত্যাগ (Dropout)। প্রায় ৮০ শতাংশ ছেলেমেয়ে প্রথম শ্রেণীতে ভর্তি হয় এবং পঞ্চম শ্রেণী সম্পন্ন হওয়ার আগে এদের অধিকাংশই স্কুল ত্যাগ করে। স্কুল ত্যাগের এই প্রবণতা প্রথম শ্রেণীর শেষে এবং তৃতীয় শ্রেণী পর্যন্ত বেশি। ব্যানবেইড এর তথ্যানুযায়ী তৃতীয় শ্রেণীতে উত্তীর্ণ হবার পূর্বেই প্রায় ৩০ শতাংশ ছেলেমেয়ে স্কুল ত্যাগ করে। নুরুল ও শরিফুল ইসলাম ১৯৯৭ একটি প্রবন্ধে উল্লেখ করেছেন, সরকারিভাবে বই ও বস্ত্র সরবরাহ করাই এদেরকে স্কুলমুখী করার জন্য যথেষ্ট নয় বরং নিচের সমস্যাগুলোর সমাধান করাও জরুরি – আকর্ষণহীন স্কুল পরিবেশ, অপর্যাপ্ত সুযোগ-সুবিধা, শিক্ষকদের নিম্নমানের আচরণ, অপ্রাসঙ্গিক শিক্ষা উপকরণ, বাসা থেকে স্কুলের দূরত্ব এবং পিতামাতার নিরক্ষতার কারণে ছেলেমেয়েদের সহযোগিতা করতে অপারগতা প্রভৃতি ছাত্রছাত্রীদের স্কুলমুখী না হবার কারণ।

স্বাস্থ্য

বস্তির স্বাস্থ্য ব্যবস্থার অবস্থা নাজুক। বিচিত্রা ১৯৯০–এ প্রকাশিত একটা জরিপ থেকে দেখা যায়, বস্তির ১০% লোক কোন না কোন জটিল রোগে আক্রান্ত। এর মধ্যে রক্ত আমাশয়, ডায়রিয়া, কলেরা, টাইফয়েড, গ্যাস্টিক, আলসার, ম্যালেরিয়া, হাঁপানি, জণ্ডিস, যক্ষ্মা ও হৃদরোগ অন্যতম। অন্যদিকে সমাজ কল্যাণ ও গবেষণা ইনস্টিটিউট কর্তৃক পরিচালিত গবেষণায় দেখা গেছে, এখানে কমবয়সী শিশুরা বেশি রোগাক্রান্ত হয় এবং এদের বেশির ভাগই পেটের পীড়া ও পানিবাহিত রোগে বেশি

ভোগে। এসব দরিদ্র পরিবার প্রায় ৯৫ শতাংশই পানি সিদ্ধ করে পান করে না। তাদের পয়ঃনিষ্কাশন ব্যবস্থাও খুব খারাপ এবং প্রায় ৪০ শতাংশ কাঁচা পায়খানা ব্যবহার করে থাকে। ৭৫ থেকে ৮০ শতাংশ লোক অস্বাস্থ্যকর গৃহে বসবাস করে। তাছাড়া যানবাহন, শিল্প কলকারখানার ধোঁয়া, বর্জ্য ও মলমূত্র বস্তি এলাকায় নানাবিধ অস্বাস্থ্যকর অবস্থার সৃষ্টি করে। এদের মধ্যে সাধারণত জ্বর, কাশি, জণ্ডিস, ডায়রিয়া, কলেরা, নানারকম চর্মরোগ, চোখের অসুখ ইত্যাদি সংক্রামক রোগের প্রকোপ থাকে সবসময়। গবেষণায় দেখা যায়, এসব অস্বাস্থ্যকর অবস্থার কারণে শিশুমৃত্যুর জাতীয় হারের চেয়ে নগর দরিদ্রদের শিশু মৃত্যুহার বেশি। শিশুমৃত্যু ছাড়া বয়স্ক মৃত্যুর হারও বেশি। বিশেষ করে শিশু মৃত্যুহার জাতীয় গড় হারের চেয়ে ১০ গুণ বেশি। নগর এলাকার সাধারণ মানুষের তুলনায় দরিদ্র এই বস্তির জনগোষ্ঠীর মৃত্যু প্রবণতা ৫ গুণ বেশি এবং এই নগর দরিদ্রের যারা রোগগ্রস্থ বা মৃত্যুমুখী হয় তাদের প্রায় এক তৃতীয়াংশ সংক্রামক ও পানিবাহিত রোগে আক্রান্ত (খান, আমানত উল্লা ১৯৯৫)। উপরের তথ্যগুলো থেকে বস্তি সম্পর্কে একটা প্রাথমিক ধারণ লাভ করা সম্ভব। এর বাইরে Coalition for the Urban Poor বস্তিবাসীদেরকে মৌলিক চাহিদা (পুষ্টি কমপক্ষে ২,১২২ ক্যালরি, বস্ত্র কমপক্ষে ২ সেট, প্রাথমিক স্বাস্থ্য সেবা প্রাপ্তির সুবিধা, প্রাথমিক শিক্ষা অথবা অক্ষরজ্ঞানসহ বৃত্তিমূলক প্রশিক্ষণ, বিশুদ্ধ খাবার পানি, পয়ঃসুবিধা এবং পরিবার পিছু' গোপনীয়তা রক্ষাকারী পৃথক ঘর) পূরণে ব্যর্থ জনগোষ্ঠী হিসাবে বর্ণনা করেছে।

সামাজিক পরিবেশ

প্রতিমা পাল মজুমদার ১৯৯৬ সালে একটি গবেষণায় দেখিয়েছেন, বস্তিতে আশ্রয় লাভ করা এবং ছোটখাট ব্যবসা টিকিয়ে রাখার জন্য বস্তিবাসীর মূল আয়ের সিংহভাগই তুলে দিতে হয় বস্তির টাউট-মাস্তান শ্রেণীর হাতে। ক্রমবর্ধমান সামাজিক নিরাপত্তার অভাবে বস্তির ১২ থেকে ১৯ বছর বয়সী তরুণীদের, ধনিক শ্রেণীর বাসায় কাজ নিতে হয় সারা দিন ও রাতের জন্য। নাজমির নূর বেগম ১৯৯৪ সালে অপর এক গবেষণায় দেখিয়েছেন নারী অপহরণ, যৌন নির্যাতনের মাত্রাও এসব এলাকায় বেশি। এসব দরিদ্র শ্রেণী, স্থানীয় প্রভাবশালী মাস্তান কর্তৃক সর্বদা নিগৃহীত, আবার কখনও কখনও অত্যাচারিত হন। অনেক সময় এসব মাস্তানদের দ্বারা যুবতী অবিবাহিত মেয়ে এবং কম বয়সী বালিকারা যৌন নির্যাতন ও ধর্ষণের শিকার হন। এই বস্তিবাসী দরিদ্র শ্রেণী শুধুমাত্র মাস্তান বা পরিবার বহির্ভূত শক্তিশালী মহল দ্বারাই অত্যাচারিত হন না বরং স্বামী কর্তৃক স্ত্রী নির্যাতন, প্রতিবেশী কর্তৃক গালাগাল এবং সামাজিক নিরাপত্তাহীনতার প্রবণতাও লক্ষ্য করা যায়। অন্যদিকে প্রচার মাধ্যম এবং বিভিন্ন গবেষণা তথ্যমতে বস্তিতে মাদকদ্রব্যসহ বিভিন্ন অবৈধ দ্রব্যের ছড়াছড়ি, যেমন, সন্ত্রাস এবং নিরাপত্তাহীনতার মাত্রা বৃদ্ধি করছে তেমন ঐ নির্দিষ্ট বস্তি এলাকার জীবনযাত্রার মানের উপরও তা প্রভাব ফেলছে। তাই, দেখা যাচ্ছে, বস্তির ভৌগলিক কাঠামো থেকে শুরু করে বস্তিবাসীর শিক্ষা, স্বাস্থ্য, পেশা কোনভাবেই স্বাভাবিক জীবনযাত্রার সহায়ক তো নয়ই বরং বেশিরভাগ ক্ষেত্রেই এ অবস্থা নতুন নতুন সমস্যা সৃষ্টি করছে।

ক্ষমতা কাঠামো

বস্তি বিষয়ক পরিষ্কার ধারণা লাভের জন্য হাজার হাজার লোক অধ্যুষিত এই বস্তিগুলোর অনিবার্য অংশ ক্ষমতা কাঠামো সম্পর্কেও স্বচ্ছ ধারণা থাকা জরুরি। বেশিরভাগ বস্তিরই ক্ষমতা কাঠামোতে সাদৃশ্যতা দেখা যায় অল্প কিছু বিষয়ের ব্যতিক্রম ছাড়া। এক্ষেত্রে সাধারণ বস্তির ক্ষমতাকাঠামো বুঝতে প্রতিমা

পাল মজুমদার, সিমিন মাহমুদ এবং রিতা আফসারীর The squatters of Dhaka city: dynamism in the life of Agargaon squatters গ্রন্থটি সহায়ক হতে পারে। এই গ্রন্থে আগারগাঁও বস্তির উপর গবেষণা কর্ম উপস্থাপিত হয়েছে।

দেখা যায়, বস্তিবাসীরা নিজেদের থাকা খাওয়ার সমস্যা নিজেরা সমাধান করলেও তাদের খুশি করে চলতে হয় গুটি কয়েক মাতব্বর বা মাস্তানকে যারা সম্পূর্ণ বস্তির ক্ষমতাকে নিজেদের মধ্যে কুক্ষিগত করে রেখেছে। কোন নিয়মে তারা বস্তির অভিভাবকত্ব পেয়েছে তা অবশ্য স্পষ্ট নয়। The squatters of Dhaka city বইটিতে দেখানো হয়েছে যে, আগারগাঁও বস্তিতে তারাই অভিভাবকত্ব পেয়েছে যাদের রয়েছে টাকা ও প্রাতিষ্ঠানিক ক্ষমতা। রাজনৈতিক দলগুলোর মদদপুষ্ট হয়েও কিছু মাতব্বর বা মাস্তান গড়ে উঠেছে। তবে ঐ গবেষণায় দেখা গেছে, প্রায় প্রতিটি মাস্তান বা মাতব্বরই হয় রিকশা ভাড়া দেয় অথবা বস্তিতে ঘর তুলে তা ভাড়া দেয় বা প্রাতিষ্ঠানিক ক্ষেত্রে চাকুরিরত, যাদের আছে টাকার জোর বা প্রাতিষ্ঠানিক ক্ষমতা।

আগারগাঁও-র ক্ষেত্রে দেখা গেছে, এই শক্তিধররাই হলো বস্তি সমাজের প্রধান। তাদের উপরই নির্ভর করে বস্তির শান্তি ও শৃঙ্খলা। ঐ জরিপে দেখা গেছে, বস্তির শতকরা ৯৫ ভাগ ঝগড়া, বিবাদ, চুরি, ধর্ষণ, ইত্যাদির বিচার (সালিশ) এদের মাধ্যমেই হয়েছে। এদের বিচারের রায় গ্রহণ করতে কেউ দ্বিধা করে না। বিভিন্ন সমাজ বিরোধী কাজও (জুয়া খেলা, মদ খাওয়া, নারী পাচার ইত্যাদি) এদের দ্বারাই বন্ধ হওয়ার নজির পাওয়া গেছে। অবশ্য এদের উস্কানিতে অনেক সমাজ বিরোধী কাজও সংঘটিত হওয়ার নজির আছে। বস্তির অর্থনৈতিক উন্নয়নও অনেকাংশে এই শক্তিধরদের উপর নির্ভরশীল। দেখা গেছে এদের অভিভাবকত্বে বস্তিতে গড়ে উঠেছে নানা ধরনের সমিতি যার মাধ্যমে বস্তিবাসীরা এনজিও এবং সরকার পরিচালিত বিভিন্ন প্রশিক্ষণ ও কর্মসংস্থান প্রকল্পে অংশগ্রহণ করতে পারছে। এরাই বস্তির শতকরা ১৫ ভাগের বেশি ঘরবাড়ি তৈরি করে বস্তিবাসীদের কাছে ভাড়া দিয়েছে বাকিগুলোর মালিক বস্তিবাসী অথবা সমপর্যায়ের লোকজন। এদেরই সহায়তায় বসানো হয়েছে বেশ কিছু নলকূপ। দরিদ্রদের জন্য বরাদ্দকৃত সরকারি ও বেসরকারি অনুদান এদের মাধ্যমেই সরবরাহ করা হয়। তাছাড়া বস্তিবাসীদের ধর্মকর্ম, বিয়ে-চেহলাম, মামলা-মকদ্দমা ইত্যাদির সাথেও মাস্তানচক্র জড়িত। অন্য কোন কর্তৃপক্ষ না থাকায় এরাই হয়ে উঠেছে বস্তির ত্রাণকর্তা। বেশিরভাগ ক্ষেত্রে এই মাস্তানদের মাধ্যমেই শহরে দরিদ্রদের কাছে পৌঁছাতে হয়। আগারগাঁও বস্তির ক্ষেত্রে দেখা গেছে, বড় দুইটি বন্যার সময়ে (১৯৮৭ এবং ১৯৮৮) ত্রাণ সামগ্রী প্রকৃত অভাবীদের কাছে পৌঁছে দেওয়ার ব্যাপারে বিভিন্ন ত্রাণ প্রতিষ্ঠান তাদেরই সাহায্য নিয়েছিলো। যদিও কমিশনারের নেতৃত্বে প্রতিটি বস্তিতে একটি প্রাতিষ্ঠানিক কাঠামো আছে। তবে কমিশনার তার কাজে সহায়তার জন্য কয়েকজন ডেপুটি মনোনিত করেন এবং বহুক্ষেত্রে ঐ শক্তিধররাই ডেপুটি হিসাবে মনোনিত হন এবং ওয়ার্ড কমিশনার হন সেই শক্তিচক্রের প্রধান।

ঐ গ্রন্থটিতে দেখানো হয়েছে এই ক্ষমতা কাঠামো বস্তি জীবনে নানা প্রতিবন্ধকতারও সৃষ্টি করে দারুণভাবে। মূল তথ্যদাতাদের কাছ থেকে পাওয়া তথ্য থেকে দেখা যায় শক্তিধরদের সন্তুষ্টি বিধান করতে বস্তিবাসীদের আয় এবং শ্রমের একটি বিরাট অংশ ব্যয় করতে হয়। দেখা গেছে যে, বস্তিতে ঘর বাঁধতে এদের সন্তুষ্ট করতে হয়, কাজ পেতে খুশি রাখতে হয়, বস্তির নানা সুবিধা ভোগ করতে এদের সন্তুষ্ট করতে হয়। এমনকি বস্তিতে অবস্থান করতেও এদের সন্তুষ্ট করতে হয় নানাভাবে। মূল তথ্যদাতাদের কাছ থেকে আরও জানা গেছে কোন কোন মাস্তান এভাবে (অর্থাৎ সন্তুষ্টি বাবদ) মাসে

১০ হাজার টাকারও বেশি রোজগার করে। তাছাড়া দরিদ্রদের বিতরণকৃত বিভিন্ন সরকারি এবং বেসরকারি সম্পদের কিছু অংশও তাদের কুক্ষিগত হয়। সুতরাং দেখা যাচ্ছে, গ্রামীণ দরিদ্রদের মত (যারা ভূমিমালিক, জোতদার, মহাজন ইত্যাদি শোষণ চক্রের শিকার) শহুরে দরিদ্ররাও নানারূপ শোষণের শিকার হচ্ছে।

বস্তি বিষয়ে প্রচলিত ধারণা ও বাস্তবতা

ঢাকা শহরে বাড়ি করার যোগ্যতাসম্পন্ন একজন স্বাবলম্বী লোককে প্রশ্ন করা হয়েছিলো, 'ক্ষমতা থাকা সত্ত্বেও ঢাকা শহরে বাড়ি করছেন না কেন?' এর উত্তরে তিনি একটি গল্প বলেন, 'উত্তরবঙ্গ থেকে আমি মেইল ট্রেনে ফাস্ট ক্লাসের একটি কামরা রিজার্ভ করে ঢাকায় আসছিলাম। সুন্দর বিছানা করে ঘুমিয়ে, ঘুমিয়ে নদী পর্যন্ত পার হলাম। হঠাৎ বিরামহীনভাবে দরজা, জানালায় প্রচণ্ড ধাক্কা শুরু হলো, সহ্য করতে না পেরে দরজা খুলে দিলাম – সাথে সাথে হাতে গাঁইতি, শাবল নিয়ে অনেক ক'জন দিনমজুর হুড়মুড় করে কামরার মধ্যে ঢুকে পড়লো। আমিও কোনমতে বসে আছি কারণ শোবার মতো পরিবেশ নেই। অনাহূত যাত্রীদের কোনো দিকে খেয়াল নাই আপনমনে নিজেদের মধ্যে কথাবার্তা বলছে। এক পর্যায়ে আমি তাদের দিকে বিস্ফারিত দৃষ্টিতে তাকিয়ে শুধু জিজ্ঞেস করলাম, 'কি ব্যাপার?' মধ্যরাতের আগন্তুকদের কাছে যেন মনে হলো প্রশ্নটি অবান্তর। শুধু একজন যুবক, ঘাড়ে গামছা, মাথায় ঝাঁকড়া চুল, খালি পায়ে আধো আলোতেই কালো শক্ত মাংসপেশিগুলো চকচক করছে, বললো 'ক্যান যামু'। এই দু'টি শব্দে সে বোঝাতে চেয়েছে আমার এ প্রশ্নটি করা ঠিক হয়নি, কারণ ট্রেনে প্রচণ্ড ভীড় অথচ তাদের যেতে হবে রুজি-রোজগারের সন্ধানে, তাদের বাঁচতে হবে, বাঁচার অধিকার তাদের আছে। আমার কামরায় জায়গা ছিলো তাই উঠে পড়েছে। নিতান্তই সহজ একটা ব্যাপার, এখানে আমি প্রশ্ন করার কে? এই ঘটনা সবসময় আমার মাথায় থাকে কারণ দেশে দরিদ্রতা, বেকারত্ব বাড়ছে, গৃহহীন, আশ্রয়হীন মানুষের সংখ্যা দিন দিন বৃদ্ধি পাচ্ছে। আমি যদি একটি বাড়ি বানাই হয়ত একদিন দেখবো এমনি অনেক মানুষ হঠাৎ করেই আমার ঘরে উঠে আসবে, যদি সেদিন আমি প্রশ্ন করি কি ব্যাপার? তারা সেদিন বলবে 'ক্যান থাকুম!'। মনজুরুল আহসান খান (২০০২), উপরের প্রশ্নটি একবার তার একজন বন্ধুর কাছে করেছিলেন উত্তরে তার বন্ধু এই গল্পটি তাকে শুনিয়েছিলেন। গল্পটি গল্পমূল্যের বাইরেও আরেকটি বিষয়ের প্রতি ইঙ্গিত করে 'শহর দরিদ্র তথা বস্তিবাসীদের জীবনযাত্রার ভাসমানতা সম্পর্কে সাধারণ লোকের ধারণা কেমন'। আবার বস্তিবাসীদের মনে করা হয় শহরের ভাসমান আবর্জনা যা সহজেই বুলডোজার চালিয়ে ধূলিসাৎ করা সম্ভব। অন্যদিকে এমনও মনে করা হয় এরা শহুরে জনজীবনে নানা অসুবিধার সৃষ্টি করছে এবং শহুরে অর্থনীতিকে নানা সমস্যায় জর্জরিত করছে। বিশেষ করে শহুরে বেকার সমস্যার জন্য প্রধানত এদেরকে দায়ী করা হয় (মজুমদার, প্রতিমা পাল ১৯৯০)। এভাবে বস্তিবাসীদেরকে কোন সময়ই আর দশজন সাধারণ নাগরিক হিসাবে বিবেচনার মধ্যে আনা হয়নি। আবার কাব্যের ভাষাতেও রং লাগিয়ে অনেকে অনেক সময় বস্তিকে উপস্থাপন করেন, "প্রতিটি বস্তিই যেন মানবসৃষ্ট এক একটি মরুভূমি! বৃক্ষহীন ধূসর প্রান্তরে সবুজের কোন ছোঁয়া নেই, নেই পাখির গান, তার বদলে এখানকার বাতাসে বিরাজ করে কার্বন-ডাই-অক্সাইড বিষ। সেই বিষ ফুসফুসে ধারণ করে বস্তি জনপদের এই মানুষগুলো, সীমাবদ্ধ আয় এবং অসীম চাহিদা বা প্রয়োজনের যে চক্র তার মধ্যে পড়ে হাবুডুবু খায় আর ভাগ্যকে অভিশাপ দেয় (হোসেন, মোকাম্মেল ১৯৯৫)।"

আবার অনেক সময় দেখা গেছে, 'কেষ্ট বেটাই চোর' হিসাবে দেখা হয়েছে বস্তি ও বস্তিবাসীদেরকে, "বস্তিবাসীদের কারণে একদিকে সরকারি, বেসরকারি উন্নয়ন ও সম্প্রসারণ প্রকল্প বাস্তবায়ন বাধাগ্রস্ত

হচ্ছে, অন্যদিকে এসব ছিন্নমূল মানুষের যত্রতত্র আস্তানাগুলো আর তাদের মানবেতর জীবনযাপনের জন্য নগরী নোংরা, দূষিত ও বিপন্ন হয়ে উঠেছে। রাস্তাঘাট, মার্কেটসহ পারিপার্শ্বিক পরিবেশকে করে তুলেছে রোগব্যাধির আখড়া, নানা ধরনের নাগরিক সুবিধাদির উপর প্রয়োগ করেছে অস্বাভাবিক চাপ (যানজট, জলজট, হাসপাতালের বেহাল অবস্থা, ফুটপাত দখল)। অনেক ক্ষেত্রে দুস্কৃতিকারী ও অসামাজিক জীবনের নানাবিধ দুষ্কর্মের আখড়ায় পরিণত এসব বস্তি ও আস্তানা নাগরিক জীবনের নিরাপত্তার প্রতি হুমকি হয়ে দাঁড়িয়েছে (হক, মো. আমিনুল ১৯৯৭)।" অনেক সময় বস্তির প্রচলিত ধারণার সাথে অপরাধী ও ড্রাগকে মিলিয়ে দেখা হয়েছে, যেমন, "বস্তি হচ্ছে অসামাজিক কার্যকলাপের উল্লেখযোগ্য আখড়া। দেশের বিভিন্ন স্থান থেকে মারাত্মক সব অপরাধ করে অপরাধীরা গোপন আবাসস্থল হিসাবে এসব বস্তি ব্যবহার করে থাকে। তাছাড়া গাঁজা, হেরোইন, ফেন্সিডিল, চরস ইত্যাদি মাদকদ্রব্যের বিক্রয় কেন্দ্র হিসাবে এবং চুরি, ডাকাতি, ছিনতাই প্রভৃতি অপকর্মে নিয়োজিতদের আশ্রয়স্থল হিসেবে বস্তি হচ্ছে একটি উল্লেখযোগ্য স্থান। অপরদিকে, বিভিন্ন রাজনৈতিক ও ব্যক্তিগত স্বার্থ উদ্ধারের জন্য এক শ্রেণীর লোক কর্তৃক প্রলোভনের শিকার হয়ে সামান্য অর্থের বিনিময়ে বস্তির শিশু-কিশোররাই বেশি ব্যবহৃত হয় এবং বিভিন্ন অবৈধ কর্ম, অস্ত্র, ককটেল ইত্যাদির সাথে জড়িয়ে খুব সহজেই এরা অপরাধের ঘৃণ্য জগতে প্রবেশ করে (সাহা, প্রদীপ ১৯৯৭)।"

বস্তির ঘরগুলো সম্পর্কেও কয়েকটি জনপ্রিয়, প্রচলিত ধারণা আমরা লক্ষ্য করে থাকি-

(১) রেললাইনের পাশে একটি ঝুপড়ি, বাঁশের চাটাই, ছেঁড়া কাপড়, পলিথিনের তৈরি। ঝুপড়ির ভেতর রশিতে টাঙ্গিয়ে রাখা একটি ময়লা শাড়ি, একটি ছেঁড়া লুঙ্গি, পুরোনো শার্ট ও বাচ্চাকাচ্চার কয়েকটি কাপড়। একপাশে খেঁজুর পাতার পাটিতে ময়লা কাঁথা গায়ে জড়িয়ে শুয়ে আছে কয়েকটি শিশু। মাথার উপর তেল চিটচিটে দুটি বালিশ (আহমেদ, আবদাল ১৯৯০)।

(২) ট্যানারির দূষিত পানির উপর গড়ে ওঠা বাঁশের তৈরি বস্তির টংঘর। ঘরের আসবাব বলতে একটি খাট, কয়েকটা কাঁথা, রং চটা আয়না আর চিরুনি। ঘরের রশিতে দু'জন মেয়ের নিত্য ব্যবহার্য জামা ও মায়ের একটি কাপড় ও বাবার লুঙ্গি। রান্না করার জন্য রয়েছে মাটির চুলা। পয়ঃনিষ্কাশন ব্যবস্থা খুবই নাজুক।

বস্তিবাসীদেরকে সাধারণত বর্ণনা করা হয় রোগব্যাধির মধ্যে বসবাসকারী একটি শ্রেণী হিসাবে, যেমন, "বস্তিতে স্বাস্থ্যসম্মত জীবনধারনের মতো কোন ব্যবস্থা (স্বাস্থ্যসম্মত পয়ঃপ্রণালী, পানীয় জল) নেই বললেই চলে, যার পরিণামে অধিকাংশ বসবাসকারীদের মধ্যে নানা ধরনের জটিল রোগ দেখতে পাওয়া যায় এবং শিশু, অপ্রাপ্ত, প্রাপ্ত এবং বৃদ্ধ সকল বয়সের বসবাসকারীগণই স্বাস্থ্যহীনতায় ভুগছে এবং এসকল ব্যাধি আশপাশের আবাসিক এলাকায় ছড়িয়ে পড়ছে (করিম, রফিউল ১৯৯৩)।" এইসব প্রচলিত বর্ণনায় বস্তিজীবনের প্রকৃত বহুবিধ মাত্রা অনুল্লিখিত রয়ে যায়। একইভাবে বস্তি উচ্ছেদের স্বপক্ষের যুক্তির ফাঁকগুলো রয়ে যায় ভাবনার অন্তরালে।

বস্তিবাসী (নীরব সেবক)

বস্তি ও বস্তিবাসীদেরকে নগরের ক্ষত হিসাবে চিহ্নিত করে তাদের জোরপূর্বক উচ্ছেদ করে নগর সমস্যা সমাধানের যে প্রচারণা সেটা কতটা যৌক্তিক, তা নিয়ে নতুন করে ভাববার সময় এসেছে বলে অনেকে ধারণা করেন। আগের অংশে উল্লেখিত বস্তি সংক্রান্ত প্রচলিত ধারণাগুলো প্রচার করে একে নগরীর মাথা ব্যথা হিসাবে উল্লেখ করে ব্যথা (সমস্যা) সারাতে মাথাকে (বস্তি) কেটে ফেলার পরামর্শ প্রদানের রেওয়াজকে অনেক নগরবিজ্ঞানী এবং গবেষক প্রশ্নবিদ্ধ করেছেন। "বস্তিবাসীদেরকে যতই ছোট করা হোক, ঢাকার জনজীবন যারা চালু রেখেছে তারা ঐ বস্তির লোক (সেন, নির্মল ২০০২)।" যারা রিকশা চালায় তারাও ঐ বস্তির লোক। বড় বড় লোকের বাড়িতে যারা কাজ করে তারাও ঐ বস্তির লোক। যে লোকটি পণ্য মাথায় নিয়ে আমাদের বাড়ির দুয়ারে আসে সেও বস্তিতে থাকে। যে লাখ লাখ মহিলা বাংলাদেশের পোশাক শিল্পকে বাঁচিয়ে রেখেছে তাদের বসবাস বস্তিতে। যার ভরসায় মা সন্তানকে রেখে কর্মস্থলে যায় তিনিও ঐ বস্তিতেই থাকেন। সরকার তাদের আবাসের ব্যবস্থা করতে পারেনি তাই এদের বাড়িঘর, সংসার বস্তিতে আজ। বস্তিবাসীদেরকে বিভিন্ন সময়ে আগাছা বা পরজীবী হিসাবে বর্ণনা করে দেখানোর চেষ্টা করা হয়েছে এরা অন্যের উপর নির্ভর করে বেঁচে আছে কিন্তু– "বস্তিবাসীরা অধিকাংশই খেটে খাওয়া মানুষ, অনেকেই শুধু বেকার-ই নয় এদের কাজের প্রকৃতি সংগঠিত বা প্রাতিষ্ঠানিক নয়। বরং একেবারেই উন্মুক্ত অর্থাৎ নানা রকমের ছোট ছোট কাজ করে এরা জীবিকা নির্বাহ করে। এই অর্থে বলা চলে যে, এরা শহুরে সমাজকে বিভিন্নভাবে সেবা করে আসছে (আমিন, মো. শহিদুল ১৯৯০)।"

মনজুরুল আহসান খান (২০০২), তাঁর একটি নিবন্ধে উল্লেখ করেছেন সুকান্তের কবিতার দুটো লাইন – "বলতে পার ধনীর বাড়ি তৈরি যারা করছে, কুঁড়েঘরেই তারা কেন মাছির মতো মরছে?" এখানে তিনি দেখানোর চেষ্টা করেছেন ঢাকা মহানগরীর মোট জনসংখ্যার ৪০ ভাগ এই বস্তিবাসী ব্যতীত, ঢাকা শহর কিভাবে অচল হয়ে যাবে। তিনি কিছু পেশার কথা উল্লেখ করেছেন যেমন– গার্মেন্টস শ্রমিক, রিকশাচালক, বেবী ড্রাইভার, ফেরিওয়ালা, হকার, দিনমজুর, নির্মাণ শ্রমিক, হোটেল ও রেস্টুরেন্ট শ্রমিক, দোকানদার কর্মচারী, ছোট দোকানদার, ক্ষুদ্র ব্যবসায়ী, কাজের বুয়া, পরিচ্ছন্ন কর্মী, কুলি এরা সবাই প্রায় বস্তিবাসী, এবং এদেরকে ছাড়া মহানগরকে কল্পনা করতে উৎসাহিত করেছেন তাহলেই এদের তথা বস্তির প্রয়োজনীয়তা আমরা অনুভব করতে পারব এবং বুঝতে পারব নগরজীবনকে স্বাভাবিক রাখতে অন্যতম নিয়ামক হিসাবে এরা দায়িত্ব পালন করে থাকে। এখন কথা হলো মহানগরের জনসংখ্যার অর্ধেকের কাছাকাছি এই বস্তির লোকজনকে বাদ দেওয়া যায় কিনা। কেবল মানবতা নয়, এর সাথে গণতান্ত্রিক অধিকার, জনগণের শিক্ষা, স্বাস্থ্য এবং বাসস্থানের অধিকারের প্রশ্নও জড়িত আছে।

বস্তিবাসীদেরকে যে তাদের অনভিপ্রেত ভৌগলিক অবস্থানের জন্য সামাজিক ব্যাধি হিসাবে বর্ণনা করা হচ্ছে এবং 'অন্য' বানিয়ে দিয়ে তাদের বিরুদ্ধে নেতিবাচক প্রচারণা চালানো হচ্ছে এর অসারতা

নানাভাবে স্পষ্ট হয়ে উঠেছে। বস্তিবাসীরা অপ্রয়োজনীয় তো নয়ই বরং অনেক ক্ষেত্রে প্রয়োজনীয়ও বটে –এ প্রসঙ্গে মাসুদ আলির (কৌটিল্য কথা ৫) বক্তব্য প্রণিধানযোগ্য, "বস্তি একটি অর্থনৈতিক প্রত্যয়, এটা সমস্যাগ্রস্ত কোন আবাসিক এলাকা নয় বরং আমাদের সমস্যাযুক্ত অর্থনীতির অবশ্যম্ভাবী প্রকাশ হলো বস্তি। দুঃখজনক হলো এক শ্রেণীর লোক দরিদ্রদের ত্রাণকর্তা হিসাবে আবির্ভূত হবার আশায় এদের অধিকারের প্রশ্ন মূলতবি রেখে এদেরকে অবাঞ্ছিত, দুঃস্থ জনগোষ্ঠী হিসাবে চিহ্নিত করে।"

আমাদের নগরের অর্থনৈতিক মানচিত্রের একটা ব্যাপক অংশ জুড়ে আছে অপ্রাতিষ্ঠানিক অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ড। জরিপ থেকে দেখা গেছে, এর একটা বড় অংশের যোগানদার হলো বস্তি, প্রায় ৬৫ শতাংশ বস্তিবাসী এর সাথে যুক্ত যার অর্থ এরাও অর্থনীতিতে অবদান রাখে। আর এ কথা সবাই স্বীকার করেন যে, এই অপ্রাতিষ্ঠানিক কাজের রয়েছে বিশেষ নাগরিক মূল্য, যেমন- মুটে, মজুর। বিভিন্ন অনিবার্য কারণে (প্রাকৃতিক, ক্ষমতাবানের সৃষ্টি) যে ব্যাপক সংখ্যক লোক গ্রাম ছেড়ে শহরে চলে আসছে, এদের কাছে বস্তি কেবল মাথা গোঁজার ঠাঁই নয়, বরং এদের শ্রমদক্ষতা অর্জন ও নাগরিক শ্রম সংস্কৃতির পাঠ নেবার প্রতিষ্ঠানও বটে। কারণ গ্রামের আদি পেশা দিয়ে নগর অর্থনীতির সাথে যুক্ত হওয়া কঠিন। এজন্য শ্রমবাজারের জন্য তাদেরকে তৈরি করতে, যাতে তারা অর্থনীতিতে অবদান রাখতে পারে সে ব্যবস্থা বস্তিই করে থাকে।

আবার দেখা যায়, বস্তিগুলো শুধুমাত্র শ্রমিকই ধারণ করে না নিয়োগকর্তাকেও ধারণ করে। গবেষণায় বস্তিতে কিছু ক্ষুদ্র শিল্প উদ্যোক্তার সন্ধান পাওয়া গেছে, যদিও তাদের পুঁজি ও শ্রমিক (নিয়োগকৃত) সংখ্যা খুবই সামান্য। আবার বস্তির এই উদ্যোক্তাদের উৎপাদিত পণ্যের ভোক্তাও অনেক ক্ষেত্রে বস্তিবাসী যেমন, ভাপা পিঠা তৈরির পরে এর ক্রেতাও হচ্ছে বস্তিবাসী মানুষ। আবার প্রায়ই বস্তি গুলোতে নিজস্ব কাঁচাবাজার বসে, কিছু ছোট দোকানও রয়েছে, যার ক্রেতা-বিক্রেতা উভয়ই বস্তিবাসী এবং এর চালান (পণ্যের) আসে নগরের কেন্দ্রীয় বাজার থেকে। এভাবেই বস্তিবাসীদের টাকার বড় অংশ মূলবাজারে (নগরের) গিয়ে পড়ে। আবার বস্তিবাসীর উৎপাদনশীলতারও স্বীকৃতি মিলে যখন এদের পণ্য (উৎপন্ন) বাইরের বাজারে যায়। সুতরাং 'বস্তিবাসীরা অর্থনীতিতে (নগরের) বোঝা' এ কথার যৌক্তিকতা আদৌ ধোপে টেকে না।

গবেষণায় দেখা গেছে, যদিও সুদের হার ২০ শতাংশের উপরে তবুও স্বজন বেষ্টনীর (পরিচিতজনদের মাধ্যমে টিকে থাকার জন্য গড়ে উঠা বস্তি সমাজ) কারণে ৭১ শতাংশ লোকই ঋণ নিয়ে থাকে অপ্রাতিষ্ঠানিক খাত তথা বস্তিবাসীদের কাছ থেকেই, তাই এদেরকে পরজীবী তো বলাই যাবে না বরং এদের রয়েছে নিজস্ব অর্থবাজার। আমরা একটু লক্ষ্য করলেই দেখতে পাব সরকারি কোষাগারে পৌঁছালেও বা না পৌঁছালেও বস্তিবাসী নাগরিকরা কড়ায়-গণ্ডায় তাদের নগরবাসের মূল্য পরিশোধ করেন। যদিও এদের আয় দৈনিক হিসাবে খুবই কম, যেমন- বাড়িভাড়া হিসাবে টাকা দেয় (বস্তি-বাসীরা), যদিও ঘরের অবস্থা খুবই খারাপ এবং এটা অনেক ক্ষেত্রে চাঁদা হিসাবে (ভাড়ার পরিবর্তে) যায় এবং অবশ্যই টাউট শ্রেণীর হাতে। এর বাইরে পানি, বিদ্যুৎ বা পয়ঃনিষ্কাশনের মতো ভৌত সুবিধাগুলোও বস্তিবাসীরা নগদমূল্যে ক্রয় করে থাকেন। যেগুলোর মূল্যও বেশিরভাগ ক্ষেত্রে সরকারি কোষাগারের পরিবর্তে বস্তির নেতাদের পকেটে থাকে। বস্তিবাসীদের (স্বল্প আয়ের বিষয়টা মাথায় রেখে) মেট্রোপলিটন পরিচয়ের উচ্চমূল্য প্রদান এটা অনেক ক্ষেত্রে 'বড় নাগরিকদের' তুলনায় অনেক বেশি। এরপরও কি বলা যায় এরা অলস, ফাঁকিবাজ, অন্যের জায়গা দখলকারী বা সমস্যা সৃষ্টিকারী?

বস্তি উচ্ছেদ

বস্তি উচ্ছেদ প্রক্রিয়াগুলো (বাংলাদেশে) যদি বিশ্লেষণ করা হয় তাহলে দেখা যাবে কখনও রাতের আঁধারে, কখনও প্রকাশ্যে কখনও পুলিশ দিয়ে, কিংবা সন্ত্রাসী দিয়ে আগুন ধরিয়ে দিয়ে উচ্ছেদ করা হয়েছে। এসব ক্ষেত্রে না মানা হয়েছে কোন আন্তর্জাতিক কনভেনশন চুক্তি, না মানা হয়েছে দেশের সংবিধান। গবেষণার আওতাধীন বস্তিটির ক্ষেত্রেও দেখা গেছে, কোন প্রকার আইন বা সংবিধান তো মানাই হয়নি বরং ক্ষমতাবানদের নতুন ধরনের কূটকৌশলের ব্যবহার করা হয়েছে। ১৯৭০ সালের Government local authority and building (Recovery of possession) ordinance xxiv-এর ধারা ৫ অনুযায়ী বেআইনি দখলদারদের উচ্ছেদ করার জন্য উচ্ছেদের ৩০ দিন আগে নোটিশ দিতে হবে। অন্যদিকে বাংলাদেশ ECOSOC (অর্থনৈতিক, সামাজিক এবং সাংস্কৃতিক অধিকার সংক্রান্ত আন্তর্জাতিক চুক্তি ১৯৯৬)-তে স্বাক্ষরকারী দেশ। এই চুক্তি অনুযায়ী প্রতিটি সরকার বস্তি উচ্ছেদের আগে সম্ভাব্য সকল বিকল্প বিষয় চিন্তা করবে যেন শক্তির প্রয়োগ এড়ানো যায়। এর বাইরেও সরকার আরো ৮টি বিষয়ের প্রতি দৃষ্টি দিতে বাধ্য- (১) উচ্ছেদকৃতদের সাথে ফলপ্রসূ আলোচনা। (২) পর্যাপ্ত সময় দিয়ে নোটিশ প্রদান। (৩) উচ্ছেদ বিষয়ে স্বচ্ছ ধারণা প্রদান। (৪) সরকারি প্রতিনিধির উপস্থিতি। (৫) উচ্ছেদ কাজে অংশগ্রহণকারীদের চিহ্নিতকরণের ব্যবস্থা থাকবে। (৬) খারাপ আবহাওয়া ও রাতে উচ্ছেদ করা যাবে না। (৭) আইনগত প্রতিবিধানের ব্যবস্থা থাকতে হবে। (৮) আইনগত সহায়তা লাভের বিধান ও ক্ষতিপূরণের বিধান থাকবে। অন্যদিকে আইন ও সালিশ কেন্দ্র ও অন্যান্য বনাম বাংলাদেশ সরকার ও অন্যান্য (১৯ বিএলডি (১৯৯৯) ৪৮৮) এবং মধুমালা বনাম বাংলাদেশ সরকার (রিট পিটিশন নং ৫৯/১৯৯৪) মামলায় আদালত পুনর্বাসন বা বিকল্প ব্যবস্থা না করে জোরপূর্বক বস্তি উচ্ছেদ বেআইনি ঘোষণা করে।

বাংলাদেশের ক্ষেত্রে দেখা যায় যে, উপরের আইনগুলো কোন সময়ই মানা তো হয় নি বরং বিভিন্ন সময়ে বিভিন্নভাবে রাজনৈতিক রং দিয়ে বস্তি উচ্ছেদ অবৈধভাবে চালিয়ে যাওয়া হয়েছে। রাজনৈতিকভাবে 'পুনর্বাসন প্রকল্প', 'সিটি পল্লী', 'বস্তিবাসীদের জন্য ফ্ল্যাট', 'গ্রামে ফিরে যাওয়া' – এ ধরনের মানুষের চোখে ধুলো দেওয়া বিভিন্ন প্রকল্প দেখিয়ে বস্তি উচ্ছেদকে বৈধ করা হয়েছে। আবার অন্যদিকে দেখা যায় সরকারি তথা রাজনৈতিক প্রচারণা – বস্তিতে অসামাজিক কাজ হয়, বস্তিতে হেরোইন ও ফেন্সিডিলের ব্যবসা হয়, বস্তি অপরাধীদের আড্ডাখানা, বস্তিতে দেহ ব্যবসা হয় – এ ধরনের প্রচারণা চালিয়ে বস্তি উচ্ছেদকে বৈধ করার চেষ্টা করা হয়। এই গবেষণা থেকে দেখা গেছে, ঐ ধরণের ঢালাও প্রচারণা বেশিরভাগ ক্ষেত্রেই ঠিক নয়।

আবার অনেক সময় দেখা যায়, হাজার হাজার বস্তিবাসীর উচ্ছেদ হওয়া, না হওয়ার সাথে রাজনৈতিক লাভক্ষতি জড়িত। উদাহরণ হিসাবে সংবাদ (০৩.০৯.২০০১) রিপোর্টটি উল্লেখ করা যায়, ২০০১ এর নির্বাচনের সময় ঢাকা ৬ আসনে ২৩ হাজার বস্তিবাসী ভোটার থাকায় প্রধান দুইটি দলের প্রার্থীই – 'আর কখনও বস্তি উচ্ছেদ করা হবে না'- এই বিষয়ে ঐক্যমত্যে পৌঁছায়। যদিও পরে তাদের কথা

প্রধান দু'টি রাজনৈতিক দলের কেউই আর রাখেনি, আবার তত্ত্বাবধায়ক সরকারকে দেখা যায় সাময়িক বাহবা লাভের আশায় অবৈধভাবে বস্তি উচ্ছেদে মনোযোগী হয়ে উঠতে। অন্যদিকে প্রথমে উল্লেখিত উচ্ছেদ প্রক্রিয়া নিয়েও অনেকে মানবাধিকারের প্রশ্ন তুলেছেন- হঠাৎ আগুন দেওয়া, গভীর রাতে বস্তি ভেঙ্গে দেওয়া, মারামারি লাগিয়ে দেয়া, বস্তি ভাঙ্গার পূর্বে যথেষ্ট সময় না দেয়া এবং বাসস্থানের সুযোগ না থাকা – এগুলো ভাষানটেক, প্রেমতলী, আগারগাঁওসহ বিভিন্ন বস্তির ক্ষেত্রে লক্ষ্য করা যায়। বর্তমান গবেষণায় ২০০৩ সালে কল্যাণপুর বস্তি উচ্ছেদের সামগ্রিক অভিজ্ঞতাটি ধারণ করার চেষ্টা করা হয়েছে।

গবেষণার উদ্দেশ্য

এই গবেষণাটির মূল উদ্দেশ্য হলো- বস্তি উচ্ছেদের পেছনের কারণ, উচ্ছেদ প্রক্রিয়া, উচ্ছেদ পরবর্তী অবস্থার প্রকৃতি ও বাস্তবতা জানা, এসময়ে সংশ্লিষ্ট মানুষদের অভিজ্ঞতা তুলে আনা এবং ঐ পরিস্থিতিতে গ্রহণ করা যেতে পারে (যেটা দরকারী/ভুক্তভোগী লোকগুলোর প্রয়োজন) এমন কোন পদ্ধতির সন্ধান করা। সর্বোপরি ঐ একই ধরনের ঘটনা ভবিষ্যতে আবার ঘটলে তখন যেন ঐ সময়ের সংগৃহীত অভিজ্ঞতার আলোকে প্রয়োজনীয় দিক নির্দেশনা দেয়া যায়।

গবেষণা পদ্ধতি

এই গবেষণার জন্য নির্বাচিত করা হয় কল্যাণপুর বস্তি। এই বস্তির পশ্চিম দিকে মিরপুর রোড এবং উত্তর ও দক্ষিণে যথাক্রমে বাংলা কলেজ রোড এবং দারুসসালাম রোড। উত্তর-পূর্ব কোণে কল্যাণপুর নতুন বাজার। বস্তিটি ছিল একটি আয়তক্ষেত্র (উত্তর-দক্ষিণ দৈর্ঘ্য ও পূর্ব-পশ্চিম প্রস্থ ধরে)। এর দক্ষিণ-পূর্ব কোণে কল্যাণপুর বালিকা বিদ্যালয়, এবং উত্তর-পশ্চিমে কল্যাণপুর হাউজিং কোয়ার্টার। স্থানীয় লোকজন ও বাস্তুহারা সেবাসংঘের মতে এই বস্তিতে ২৫ হাজার লোকজন বসবাস করত এবং এখানে মোট ৮টি ইউনিট ছিল।

প্রধান গবেষক কর্তৃক অংশগ্রহণমূলক পর্যবেক্ষণ (Participant observation) হিসাবে বস্তিতে বেশিরভাগ সময় অবস্থান করা এবং এটিকে প্রধান গবেষণা কৌশল হিসাবে গ্রহণ করায় উচ্ছেদ পরবর্তী অনেক ঘটনাই পর্যবেক্ষণ করা সম্ভব হয়। অন্যদিকে প্রধান তথ্যদাতা হিসাবে স্থানীয় একটি এনজিও'র ম্যানেজারসহ দুইজন কর্মী এবং ৩ জন বস্তিবাসীকে (এখনও টিকে থাকা) নির্বাচিত করে অনেক বিষয়ে তথ্য সংগ্রহ করা হয়েছে। যারা স্থান (বস্তি) ত্যাগ করেছে তাদেরকে খুঁজে বের করা যদিও সমস্যাজনক ছিলো কিন্তু Snow ball method ব্যবহার করায় বিষয়টি অনেক সহজ হয়ে যায়। বেশিরভাগ সময় তথ্য সংগ্রহের জন্য অবকাঠামোগত তথা খোলা প্রশ্নের সাহায্য নেওয়া হয়েছে। তথ্যের একটা বড় উৎস ছিল স্থানীয় দোকানদার বা চায়ের দোকান – এখানে বসে বসে উপস্থিত লোকজনের সাথে নির্দিষ্ট বিষয় ধরে ছোট ছোট প্রশ্নের মাধ্যমে কাঙ্ক্ষিত বিষয়ের উপর তথ্যের সন্ধান করতে হয় যা যথেষ্ট ফলপ্রসূ হয়েছে। আবার ড্রাগ, দেহ ব্যবসার মতো স্পর্শকাতর বিষয়ে কথা বলার জন্য কিছু কাঠামোগত প্রশ্ন দিয়ে তথ্য খোঁজার চেষ্টা করা হয়েছে। বস্তিতে এবং বাইরে (স্থান ত্যাগ করার পর বর্তমান অবস্থান) অনেক সময় ছোট ছোট গ্রুপ করে বসে বস্তিবাসীদের কাছ থেকে 'আড্ডার' মাধ্যমে নির্দিষ্ট বিষয় ধরে আলোচনা করে তথ্য বের করা হয়েছে। এর বাইরেও কিছু পদ্ধতি যেমন, একটা রাত বস্তিতে থেকে তুলে আনার চেষ্টা করেছি ঐ শীতের তীব্রতার মধ্যে বস্তিবাসীদের

কষ্টের জীবনযাপনের প্রকৃত চিত্র। 'টুকরো কথাবার্তা' বা নির্দিষ্ট একটি বিষয় বা ঘটনা ধরে বস্তির মধ্যে যাকে পাওয়া যায় তার সাথে কথা বলে বা প্রশ্ন করে তথ্য বের করার চেষ্টাও খুব ফলপ্রসূ হিসাবে কাজ করেছে। তথ্য হিসাবে কিছু গ্রহণ করার আগে বারবার বিভিন্নভাবে বিভিন্ন জনের কাছ থেকে যাচাই করে নেওয়া হয়েছে।

উল্লেখ্য, বিগত ২২.১২.২০০৩ তারিখে বস্তি উচ্ছেদ হলে ০৫.০১.২০০৪ তারিখে প্রাথমিক ধারণা লাভের জন্য মাঠ হিসাবে কল্যাণপুর বস্তি পর্যবেক্ষণ করা হয় এবং ০৭.০১.২০০৪ থেকে ১৫.০২.২০০৪ এর মধ্যে মাঠকর্ম শেষ করা হয়। বস্তিতে মাঠকর্ম চলাকালীন সময়ে বিভিন্ন ধরনের পরিচয়ে আমাকে পরিচিত হতে হয়েছে যেমন–'নায়ক'। বস্তির অনেকেই আমাকে সাংবাদিক বা গোয়েন্দা বিভাগের লোক হিসাবে মনে করতো। কেউ কেউ বলেছে, 'সিনেমায় দেখেছি নায়ক সবসময় লোকজনের সাথে মিশে গান গায়, মারামারি করে, শেষে পরিচয় দেয় - আমি সিআইডি'র লোক, আপনিও বস্তিতে থাকেন ঠিকই তবে শেষে বলবেন 'আমি সিআইডি'র লোক।' কোন এনজিও সম্পর্কে তথ্য নিতে গেলে সবাই ভাবতো আমি ঐ এনজিও'র কর্মী এবং শুনতে হতো নানা অভিযোগ, 'কেন বস্তি ভাঙ্গার দিন বাঁধা দিলেন না? স্কুল আবার কবে খুলবে? ডাক্তার কবে আসবে?' আবার কখনও শুনতে হয়েছে 'পায়খানার স্যার' সম্বোধন। এধরনের সম্বোধনের কারণ কি জানতে চাইলে বলে যে, এখানে 'ফুলকি' (স্যানিটেশন সংক্রান্ত কাজে জড়িত এনজিও'র) ল্যাট্রিন ছিলো না? নাম নিয়েও হয়েছে অনেক হাস্যরস। ক্রিস্টফার নামে একজন কানাডীয় গবেষক কিছুদিন আগে ঐ বস্তিতে গবেষণা করে গেছেন। তার কাজের সাথে আমার কাজের মিল খুঁজে পাওয়ায় অনেকে আমাকে 'কিরিস্টাব' বলতো। একই ভাবে নামের শেষ অংশ রশীদ হওয়ায় কেউ কেউ ডেকেছে 'রইস্যা' বলে। আবার সেপ সেভ এনজিও'র কর্মীরা কৌতুক করেছে, আপনার নাম 'কৃমি,' কারণ কৃমির মতো আপনিও মানুষের পেটে গিয়ে কথা বের করে আনেন। আপনার নাম 'দুরবিণ' কারণ খালি দূরের গোপন কথা শোনার চেষ্টা করেন।

কল্যাণপুর বস্তি

গবেষণা কাজটির উদ্দেশ্যের একটা বড় অংশ বস্তি ও বস্তি উচ্ছেদকে কেন্দ্র করে আবর্তিত। গবেষণাপত্রের প্রথম অধ্যায়ে বস্তি সম্পর্কে ধারণা দেওয়া হয়েছে। অন্যদিকে মাঠ হিসাবে যেহেতু কল্যাণপুর বস্তিকে নির্বাচিত করা হয়েছে সেহেতু এই বস্তি সম্পর্কেও প্রয়োজনীয় তথ্য থাকা আবশ্যক। এখানে উল্লেখ করা প্রয়োজন যে, বস্তির শ্রেণীবিভাগ অনুযায়ী কল্যাণপুর বস্তিকে সরকারি বস্তি বলা যায়।

ইতিহাস

এ বিষয়ে তথ্যের জন্য নির্ভর করেছি ঐ বস্তিতে প্রথম থেকে অবস্থান করা বয়স্ক লোকজন এবং বস্তি তৈরির সাথে যুক্ত থাকা নেতাদের উপর। আঠারো বছর আগে মিরপুরসহ আরও কয়েকটি জায়গার মতো কল্যাণপুরের এই অংশটিও বিহারীদের (আটকে পড়া পাকিস্তানীদের) পুনর্বাসনের জন্য সরকার বন্দোবস্ত করে কিন্তু এ সিদ্ধান্ত কার্যকর হয় নি। তখন ভোলা জেলার সালাম শিকদার এই এলাকায় বসবাস করতেন যার ইমেজ ছিলো বড় মাস্তান হিসাবে, পুলিশের সাথে উঠবস ছিল তার, তিনি তার 'চামচা' (ল্যাংড়া রুহুল, বাবু সহ আরো অনেকে)-দের নিয়ে বুদ্ধি করেন এই খালি জায়গা দখল তথা বস্তি গড়ার। সেই বছর ভোলায় (শিকদারের জেলা) দেখা দেয় ব্যাপক নদী ভাঙ্গন। শিকদার এটিকেই কাজে লাগান বস্তির গোড়াপত্তন করার মাধ্যম হিসাবে। নদীভাঙ্গা লোকজনকে তিনি স্বচ্ছলতার লোভ দেখিয়ে, নিজের টাকায় ঘর করে দিয়ে এখানে নিয়ে আসেন- উদ্দেশ্য বস্তি চালু করা। একটা সময় আর জোর করতে হয় না, অভাবী মানুষগুলো নিজ উদ্যোগে আসতে থাকে। সুযোগ বুঝে শিকদার ১ হাত জমি ২০ টাকা হিসাবে বিক্রি করতে থাকে। ধীরে ধীরে বস্তির আয়তন বাড়তে থাকে, বস্তির নাম হয় শিকদার বস্তি। বস্তিতে তখন তার একক নিয়ন্ত্রণ কারণ একদিকে প্রতিষ্ঠাতা, অন্যদিকে তার নিজ জেলার নদী ভাঙ্গা লোকজনই বেশি (অনুসারিও বটে)। এ সময় মহল্লাবাসীদের (বস্তির পাশেই ব্যক্তি মালিকানাধীন বিল্ডিং-এ থাকা লোকজন) সাথে শিকদারের সমস্যা সৃষ্টি হয় কারণ মহল্লাবাসীদের অভিযোগ ছিলো বস্তির কারণে এই এলাকার পরিবেশ নষ্ট হচ্ছে, ড্রাগ বিক্রিসহ বখাটেদের উৎপাত বৃদ্ধি পেয়েছে। এই ইস্যুগুলো নিয়ে সেসময় মহল্লাবাসী শিকদারকে দোষারোপ করতো এবং এই বিষয়ে মাঝেমধ্যেই দুইপক্ষের (বস্তিবাসী ও মহল্লাবাসী) মধ্যে মারামারি হতো। ঠিক এরকম একটা সময়ে বস্তিটি আগুন লেগে পুড়ে যায় ১৯৮৯ সালে। অনিবার্যভাবে বস্তির লোকজন মহল্লাবাসীকে দায়ী করে বলে, 'বস্তি উঠিয়ে দেওয়ার জন্য মহল্লাবাসীরা এটা করেছে।' আবার ভিন্নমতও অনেকে দিয়ে থাকে, 'সরকারি রিলিফ পাবার আসায় শিকদারের লোকজন নিজেরাই বস্তিতে আগুন দিয়েছে।' আর এই আগুন লাগার ফলাফল ছিলো দুইটি – (১) বস্তির নাম পরিবর্তন হয়ে পোড়া বস্তি হয় এবং (২) বস্তি ও মহল্লার মধ্যে বিরোধ চরম আকার নেয়।

কিছু সরকারি ও বেসরকারি সাহায্য এবং নিজেদের প্রচেষ্টায় বস্তিবাসীরা আবার নিজেদের সবকিছু গুছিয়ে নেয়। ১, ২, ৩ করে ৮টি ইউনিটে বিশাল আকার ধারণ করে এই বস্তি (মানচিত্র ১)। তখনও বস্তিতে শিকদারের একক নিয়ন্ত্রণ। পুলিশ, নেতাসহ সবার সাথে তার উঠাবসা। মহল্লার নেতা খোকনকে ধরে এনে ১৯৯২-এর দিকে বস্তির লোকজন তার চোখ উঠিয়ে নেয়। মহল্লবাসীর বিরুদ্ধে বস্তি পোড়ানোর প্রতিশোধ হিসাবে এটা চিহ্নিত হয়। মহল্লাবাসীরা শিকদারসহ আরও কয়েকজনের বিরুদ্ধে কেস করে। জানা যায়, এ সময় মহল্লাবাসীরা এই কেসের জন্য অনেক টাকা খরচ করে (পুলিশকে ঘুষ দেওয়া)। এর ফলে পুলিশ শিকদারকে ধরে নিয়ে গিয়ে শারীরিক নির্যাতন করে, কিছুদিন পর যদিও তাকে ছেড়ে দেয় কিন্তু অল্প দিন পর সে মারা যায় (সবার ধারণা ঐ নির্যাতনের কারণে)। এই বস্তি সম্রাট মারা যাবার পর বস্তি একক নিয়ন্ত্রণ থেকে বের হয়ে দলীয় নিয়ন্ত্রণের দিকে চলে যায়। যে শিকদারের কথায় বস্তির সবকিছুই নিয়ন্ত্রিত হতো তা এখন বড় দুইটি রাজনৈতিক দলের সাথে সম্পৃক্ত দুইটি দলের দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হতে থাকে। বিভিন্ন সময় সরকার পরিবর্তনের সাথে সাথে দলগত নিয়ন্ত্রণও পরিবর্তিত হয়। কয়েক বছর আগে এই বস্তি উচ্ছেদ করার একটি উদ্যোগ সরকার গ্রহণ করে, কিন্তু বস্তিবাসী, এনজিও প্রতিনিধি এবং ড. কামাল হোসেনের তৎপরতায় সে চেষ্টা ব্যর্থ হয়। বর্তমানে ১ ও ৫ নং ইউনিট ছাড়া বাদবাকি ৬টি ইউনিট মাটির সাথে গুড়িয়ে দেওয়া হয়েছে।

মানচিত্র ১. কল্যাণপুর বস্তি

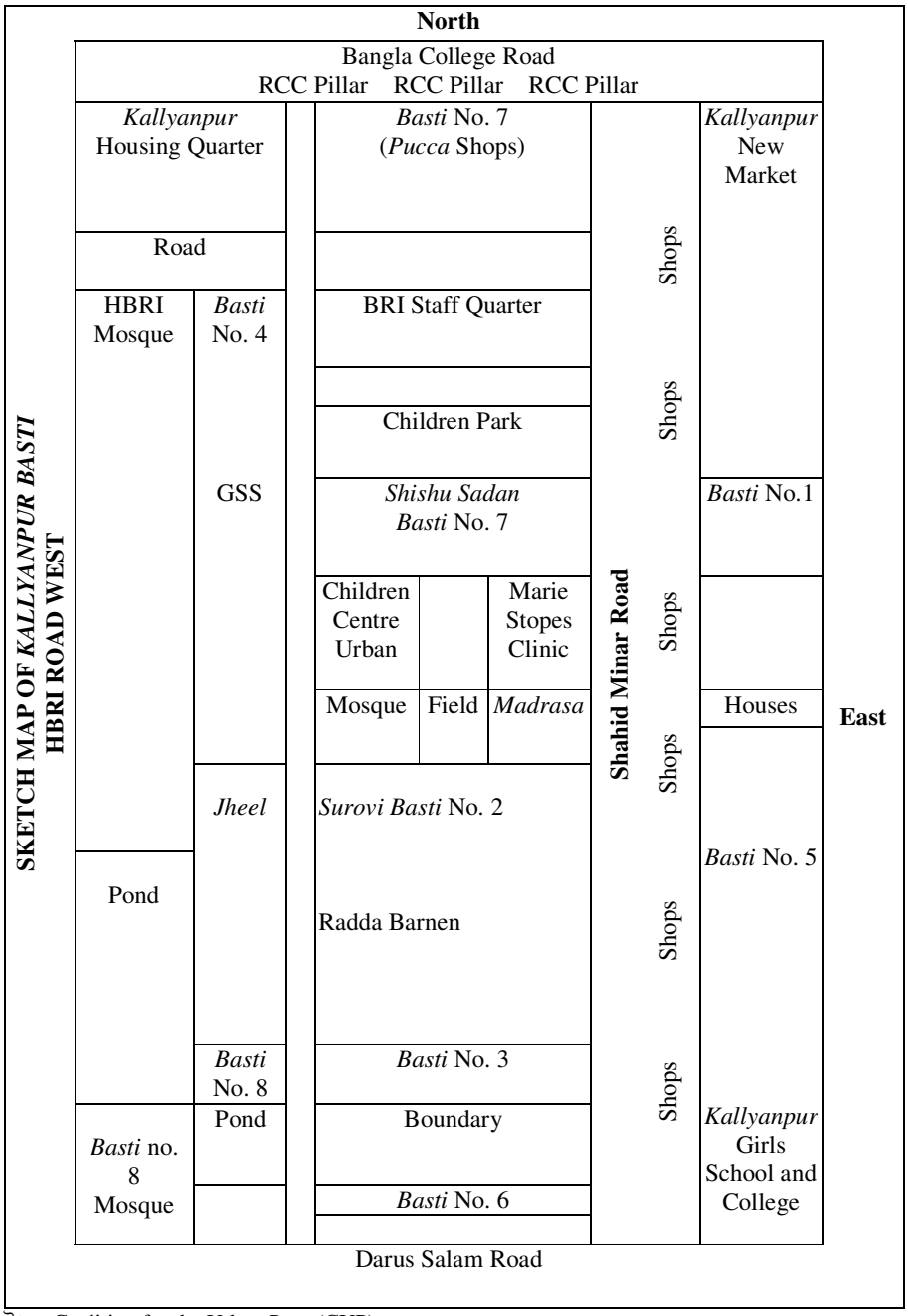

উৎস: Coalition for the Urban Poor (CUP)

উচ্ছেদপূর্ব বাস্তবতা

কল্যাণপুর বস্তি উচ্ছেদের প্রায় ১৪ দিন পর গবেষক হিসাবে প্রথম ঐখানে উপস্থিত হই। এর পূর্বে কখনও ঐ বস্তিতে যাওয়ার অভিজ্ঞতা যেহেতু ছিলো না সেহেতু উচ্ছেদপূর্ব বাস্তবতা বোঝার ক্ষেত্রে পূর্বেকৃত কিছু গবেষণাপত্র এবং স্থানীয় লোকজনের সাথে কথার (স্মৃতির ভিত্তিতে) উপর নির্ভর করতে হয়েছে।

সংযুক্ত মানচিত্রে দেখা যাচ্ছে, বস্তিতে মোট ৮টি ইউনিট ছিলো। 'মহল্লার মতো সুন্দর', 'বেহেস্ত ছিল', এধরনের মন্তব্য দিয়ে যেমন অনেকে বস্তির বর্ণনা দিয়েছেন তেমনি অনেক বস্তিবাসী 'ময়লার ট্যাংকি' (অপরিষ্কার অর্থে) হিসাবে বস্তিকে বর্ণনা করেছেন। ৮টি ভাগে বিভক্ত ঐ বস্তির প্রত্যেক ভাগে মোটামুটি একজন করে দলনেতা ছিলো। এ সকল দলনেতা স্থানীয় প্রশাসন, মাস্তান ও অন্যান্য সংস্থার সহায়তায় বস্তিবাসীদের ভাগ্য বিধাতা হিসাবে দায়িত্ব পালন করতো এবং এর সাথে জায়গা লুটের ব্যাপারটিও ছিল। নিচের পরিসংখ্যান থেকে কল্যাণপুর বস্তির লোকসংখ্যা ও ঘরের মালিকানা সম্পর্কে পরিষ্কার ধারণা পাওয়া যাবে।

সারণী ৮. কল্যাণপুর বস্তির জনকাঠামো

বস্তি নং	মোট পরিবারের সংখ্যা	ঘরের সংখ্যা	ঘরের মালিকানা		
			বস্তিবাসীর নিজস্ব ঘর	মালিক	ঘরের সংখ্যা
১	২৭০	২৬১	৭০	৫	১৯১
২	১৭৫	১৬৭	৬০	৪	১০৭
৩	১৮৫	১৭৭	৩০	৩	১৪৬
৪	২০০	১৮৭	২৫	৫	১৬৭
৫	২৩০	২২১	৩১	৬	১৯০
৬	১৯০	১৮৩	৪০	৭	১৪২
৭	১৫৫	১৪৮	২১	৩	১২৫
৮	২৭০	১৬২	৫০	৪	২১১
মোট	১৬৭৫	১৬০৬	৩২৭	৩৭	১২৭৯

সূত্রঃ করিম (১৯৯৩)

উপরের ছক থেকে দেখা যাচ্ছে কল্যাণপুর বস্তিতে ঘরের সংখ্যা ছিলো ১,৬০৬টি, সেখানে মোট ১,৬৭৫টি পরিবার বসবাস করতো এবং বিভিন্নভাবে তারা নিজেদের রান্নার ব্যবস্থা করতো। এখানে উল্লেখ্য যে, যে সব পরিবারের কোন ভিন্ন ঘর (ইউনিট) নেই তারা অন্য পরিবারের সাথে থাকতো ও মাত্র অল্প কিছু ভাড়া দিয়ে রাত্রিযাপনের জন্য শহরে থাকার ব্যবস্থা করতো। এ ধরণের পরিবারের সংখ্যা শতকরা ৪.১২ ভাগ ছিলো। গৃহের মালিকানার পরিসংখ্যান থেকে দেখা যায়, মোট ১৬৭৫টি পরিবারের মধ্যে মাত্র ৩২৭টি পরিবারের নিজস্ব ঘর ছিলো যা মোট বসবাসরত পরিবারের মাত্র ১৯.৫২ ভাগ। বাদবাকি ৮০.৪৮ ভাগ পরিবার ভাড়া ঘরে বসবাস করতো। এর বাইরে মাত্র ৩৭ জন ব্যক্তি ১,২৭৯টি ঘরের মালিক, যাদের ৯ জন ছাড়া অন্য ২৮ জনই বস্তির বাইরে বসবাস করতো। উল্লেখিত ৩৭ জন (১৯.৫২%) ব্যক্তি মোট ঘরের মধ্যে ৭৯.৬৪ ভাগ ঘরের মালিক আর ৮০.৪৮ ভাগ বস্তিবাসী মাত্র ২০.৩৬ ভাগ ঘরের মালিক ছিলো। এই তথ্য থেকে দেখা যায়, ঐ বস্তিতে যে সকল লোকজন বসবাস করতো তাদের মধ্যে অল্প সংখ্যক বসবাসকারীই কেবল ঘর নির্মাণ করে বিনাভাড়ায় বসবাস

করতো। অন্যদিকে নেতা শ্রেণীর কতিপয় লোক এ স্বত্বহীন বস্তিকে কেন্দ্র করে প্রচুর ফায়দা লুটতো। তখন এমনও দেখা যেতো (উচ্ছেদের আগে) যে শুধুমাত্র ঘরভাড়া দিয়েই নেতার কাছ থেকে প্রতি মাসে ১০-১৫ হাজার টাকা আয় করতো। বস্তির এই চিত্র পাওয়া যায় ১৯৯৩-এর জরিপ থেকে, যদিও বিগত বছরগুলোতে বস্তির ঘরের সংখ্যা তেমন বাড়েনি (জায়গা যেহেতু নির্দিষ্ট) কিন্তু লোকসংখ্যা অনেক বৃদ্ধি পেয়েছিলো বলে ধারণা করা হয়। বস্তি উচ্ছেদের আগে পঁচিশ হাজার লোক এই বস্তিতে বসবাস করতো বলে অনুমান করে বস্তির মানুষজন, তবে বস্তির ঐ মালিকানার ধরণ একই ছিলো বলে ধারণা করা হয়।

কল্যাণপুর বস্তিতে প্রতিটি এলাকার জন্য মাত্র দুইটি ওয়াসার সংযোগ ছিল। এ তথ্য থেকে প্রমাণিত হয় প্রতিটি সংযোগে গড়ে ১,২৮৬ জন লোক পানি সংগ্রহ করতো যা চাহিদার তুলনায় অপ্রতুল ছিল। শুধুমাত্র খাবার পানি সংগ্রহ করতে ঘন্টার পর ঘন্টা অপেক্ষা করতো। যেহেতু অধিকাংশ পুরুষ ও মহিলা দিনের বেলা বিভিন্ন কাজে চলে যায়, তাই গভীর রাত পর্যন্ত লাইনে দাঁড়িয়ে পানি সংগ্রহ করতে দেখা যেতো। এই জটিলতা এড়ানোর জন্য বস্তিবাসীদেরকে দেখা যেতো বস্তির মধ্যের জলাশয় থেকে নিয়মিত পানি সংগ্রহ করতে।

অন্যান্য স্বত্বহীন বস্তির মতো এখানে পরিকল্পিত পয়ঃপ্রণালী ছিলো না। অধিকাংশ পরিবারই খোলা পায়খানা ব্যবহার করতো। মাত্র ৯.৭৬ ভাগ পরিবার গর্তের মুখে ঢাকনা ব্যবহার করতো। বাদবাকি ৯৮.২৪ ভাগ পরিবারই খোলা জায়গায় পায়খানা করতো। তাছাড়া ১ থেকে ৭ বছরের প্রায় সকল ছেলেমেয়েই বস্তির আশেপাশে খোলা জায়গায় পায়খানা করতো। কল্যাণপুর বস্তির স্বাস্থ্য ব্যবস্থার হাল করুণ ছিলো। ঐ জরিপে দেখা যায়, অধিকাংশ শিশুই পুষ্টিহীনতায় ভুগতো, তাছাড়া সর্দি, কাশি, ক্রিমি এবং পেটের অসুখে অধিকাংশ শিশুই আক্রান্ত ছিলো। অন্যদিকে পুরুষরা যেহেতু অধিকাংশই শ্রমিক এবং ধূমপায়ী ছিল সেহেতু কাশিতে আক্রান্ত পুরুষের সংখ্যা বেশি ছিল। আবার অধিকাংশ মহিলা (প্রায় ৬৬ শতাংশ) পেটের অসুখ এবং ৫৬ শতাংশ সর্দিজনিত রোগে আক্রান্ত ছিলো। তবে অন্যসব সাধারণ বৈশিষ্ট্যও (বস্তির) এখানে বিদ্যমান ছিল, যেমন, দু'টি ঘরের মাঝে একটি সাধারণ দেওয়াল, মাঝখানে যাতায়াতের সরু রাস্তা ইত্যাদি (করিম, রফিউল ১৯৯৩)।

বসতি বাস্তবতা

পূর্বেই উল্লেখ করা হয়েছে যে, বস্তি সম্পর্কে বিভিন্ন গবেষণা এবং প্রচার-প্রচারণায় এমনটা দেখানোর চেষ্টা করা হয় যে, 'বস্তিবাসীরা হলো এমন একটি শ্রেণী যারা নোংরা পরিবেশে সরকারি জায়গায় ফ্রি কিংবা নাম মাত্র মূল্যে অবস্থান করে'। কল্যাণপুর বস্তির ক্ষেত্রে আমরা দেখতে পাব 'বাস্তবে বস্তি'র চিত্র সম্পূর্ণ ভিন্ন। কারণ, এই বস্তির লোকজন বর্গফুট হিসাবে, ঢাকার অভিজাত এলাকা গুলশান, বনানীর চেয়েও বেশি টাকায় ভাড়া থাকে।

কল্যাণপুর বস্তি এলাকায় ঘর ভাড়ার সাথে সরকারি স্টাফ কোয়ার্টার এবং কল্যাণপুর আবাসিক এলাকার বাড়ি ভাড়ার একটি তুলনামূলক চিত্র সারণী ৯ এ উপস্থাপিত হল:-

সারণী ৯. বর্গফুট প্রতি বাসস্থান ভাড়া

এলাকা	ঘরের আকার	ঘরের ধরন	সুবিধা			ভাড়া			প্রতি বর্গফুটের ভাড়া	মন্তব্য
			পায়-খানা	গোসল খানা	রান্না ঘর	পানি বিদ্যুৎ গ্যাস ছাড়া	পানি বিদ্যুৎ গ্যাসসহ	বিদ্যুৎ পানিসহ		
কল্যাণপুর আবাসিক এলাকা	২০০০ ব:ফু:	ফ্ল্যাটবাড়ি মোজাইকসহ	২	২	২	-	৩,৫০০/-	-	১.৭৫ ১৩,২৬০/-	
সরকারি কোয়ার্টার	১৪৭০ ব.ফু.	ফ্ল্যাটবাড়ি মোজাইকসহ	২	২	১	-	মূল বেতন অনুসারে	-	১৫০-২৫০ ৯,৭৪৬.১০	স্থান ও গুণগত মানের উপর নির্ভরশীল
বস্তি এলাকা	(৮ফুট× ৫ফুট)= ৪০ ব.ফু.	অস্থায়ী ও কাঁচা	×	×	×	১৫০/-	-	(১৫০+ ১০০) +১০+৫= ২৬৫	৬.৬৩	প্রচুর চাহিদাপূর্ণ এলাকায় প্রায় বাণিজ্যিক ব্যবহারের ন্যায়

সূত্র: করিম (১৯৯৩)

সারণী ৯ থেকে দেখা যায়, কল্যাণপুর আবাসিক এলাকায় স্বাস্থ্যসম্মত পরিবেশে গ্যাস, পানি, বিদ্যুৎ ও অন্যান্য প্রয়োজনীয় সুযোগ-সুবিধাসহ মোজাইক করা ২,০০০ বর্গফুটের একটি বাড়ির ভাড়া ৩,৫০০.০০ টাকা যা প্রতি বর্গফুট ১.৭৫ টাকা হয়। তাছাড়া সরকারি কোয়ার্টারে বসবাসকারী কর্মকর্তাগণ ১,৪৭০ বর্গফুটের বাড়িতে তাদের মূল বেতনের উপর ধার্য করা হারে ভাড়া প্রদান করেন। অন্যদিকে জরিপে দেখা যায়, ঐ বস্তিতে (৮×৫)= ৪০ বর্গফুটের অস্থায়ী, অস্বাস্থ্যকর, বাঁশ ও কাগজের তৈরি, গ্যাস, রান্নাঘর, পায়খানা, বিদ্যুৎ ও পানি ছাড়া একটি ঘরের ভাড়া ১৫০ টাকা, ১০০ টাকা বিদ্যুৎসহ মাসিক চাঁদা ৫ টাকা ও ১০ টাকা, পানিসহ মোট = ২৬৫ টাকা। যার প্রতি বর্গফুটের ভাড়া দাঁড়ায় ৬.৬৩ টাকা। অন্য একজন অধিবাসী স্বাস্থ্যকর পরিবেশে কল্যাণপুর আবাসিক এলাকায় ২০০০ বর্গফুটের একটি বাড়ি ভাড়া দেয় (২০০০×৬.৬৩)= ১৩,২৬০ টাকা। এ হিসাবে একজন কল্যাণপুর বস্তিবাসী প্রতি বর্গফুট তার তুলনায় প্রায় ৪.৮৮ টাকা বেশি ভাড়া দেয় যা বাণিজ্যিক ব্যবহারের জন্য নির্মিত বহুতলা ভবনের ভাড়ার প্রায় কাছাকাছি। আর এই ভাড়া গুলশান, ধানমণ্ডি এলাকার আবাসিক এলাকার চেয়ে বেশি তো বটেই।

ক্ষমতা কাঠামো

গবেষণাপত্রের প্রথম অধ্যায়ে বস্তির ক্ষমতা কাঠামো সম্পর্কে ধারণা রাখার চেষ্টা করা হয়েছে। এ অধ্যায়ে গবেষণার আওতাধীন কল্যাণপুর বস্তির ক্ষমতাকাঠামো'র ধরণ ও প্রক্রিয়াগুলো নিয়ে আলোচনার অবকাশ রয়েছে।

"আল কারিয়াতুল-ওয়াল কারিয়া -
কথা কইলে দিবো থাপড়াইয়া।
পরের .... না মারলে, বস্তির লিডার হয় কোন শালা?"

বস্তির ক্ষমতাকাঠামোর গুরুত্বপূর্ণ চরিত্র লিডারদের নিয়ে কল্যাণপুর বস্তির ফকরুদ্দিন পাগলার রচিত কবিতা এটি। বস্তির লিডারদের ইমেজের করুণ হাল প্রকাশ পায় এখানে। সমস্যার বিষয় হলো কল্যাণপুর বস্তি যেহেতু উচ্ছেদ হয়ে গেছে সেহেতু এ বিষয়ে তথ্যের জন্য অবশিষ্ট বস্তিবাসী, প্রধান তথ্যদাতা এবং অল্প কয়েকজন নেতার (বস্তির) সাহায্য নেওয়া হয়েছে। এতে করে কিছু সীমাবদ্ধতা রয়েই গেছে কারণ গবেষক হিসাবে ক্ষমতা চর্চা, প্রক্রিয়া, ধরণগুলো পর্যবেক্ষণের সুযোগ হয় নি, শুধুমাত্র স্বাক্ষাৎকারের উপর নির্ভর করেই এ সংক্রান্ত তথ্যের সন্ধান করতে হয়েছে। কল্যাণপুর বস্তির নেতাদের ক্ষেত্রে দেখা গেছে তাদের অতীত জীবন নিয়ে বস্তিবাসীদের বেশ আগ্রহ রয়েছে এবং প্রায় প্রত্যেক নেতারই একটা বিতর্কিত অতীত জীবন রয়েছে, এক্ষেত্রে ২/১টি বিষয় সম্পর্কে তথ্য দিলে ব্যাপারটি স্পষ্ট হবে, (১) 'কলেরা' বস্তিবাসীরা এই নামে বস্তির প্রভাবশালী নেতা তাহের চেয়ারম্যানকে ডেকে থাকে, কারণ এই নেতা বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন বস্তিতে ঘর ভাড়া নিয়ে ভাড়াটিয়া হিসাবে থেকেছে এবং কয়েক মাসের মধ্যে ঘরভাড়া বন্ধ করে দিয়ে – গায়ের জোরে, ঝগড়া করে, নিজেই মালিক সেজে বসেছেন এবং ঐ ঘরের দখল নিয়েছেন। এই কারণে তাকে সবাই 'কলেরা' বলেন কারণ – 'কলেরা' যেমন এক জায়গায় হলে আশেপাশের পরিবেশ সব নষ্ট হয়ে যায় তেমনি ঐ তাহের কোন জায়গায় ঢুকলে সেখানকার পরিবেশও নষ্ট হয়ে যায়। (২) 'ল্যাংড়া'-হাঁটতে একটু সমস্যা, বস্তির ঘর এবং দোকানমালিক সাহাবুদ্দিনকে বস্তিবাসীরা ল্যাংড়া নেতা নামেই ডেকে থাকে কথিত আছে, ভোলা থেকে নদীভাঙ্গায় সে সর্বস্বান্ত হলে, শিকদার (বস্তির প্রতিষ্ঠাতা) তাকে এই বস্তিতে পুনর্বাসন করে। প্রথম অবস্থায় সে বস্তিতে এসে টোকাই হিসাবে ছিলো, আস্তে আস্তে জায়গা দখল সহ বিভিন্ন কারণে সে ধনী ও নেতা হিসাবে আত্মপ্রকাশ করে। তবে ঐ 'বিভিন্ন কারণগুলো' নিয়ে বস্তিবাসীদের মধ্যে অনেক ধরণের কথাবার্তা আছে, যেমন – চুরি, ছিনতাই, ড্রাগ বিক্রি, দেহ ব্যবসায়ীদের দালাল।

কল্যাণপুর বস্তিতে ১২ বছর আগের একটি কমিটি ছিলো, যেখানে একটি মিটিং-এ উপস্থিত বস্তি-বাসীদের কণ্ঠভোটের মাধ্যমে একজন চেয়ারম্যান (তাহের চেয়ারম্যান) এবং প্রত্যেক ইউনিট থেকে একজন করে প্রতিনিধি নির্বাচিত হয়েছিল। উচ্ছেদের সময় এই কমিটির চেয়ারম্যান ছাড়া আর তেমন কেউ সে অর্থে সক্রিয় ছিল না, কিন্তু ঐ কমিটিই ছিল উচ্ছেদ সময় পর্যন্ত একমাত্র লিখিত, স্বীকৃত ক্ষমতা- যেটা বস্তিবাসীরা অর্পণ করেছিল নেতাদেরকে। তবে দীর্ঘ সময়ের অভিজ্ঞতা থেকে দেখা গেছে, প্রধান দুইটি রাজনৈতিক দলের সমর্থক হিসেবে ছিলো এই বস্তিতে দুইটি দল। এই সমর্থক দল দুইটি'ই বস্তিতে নিজেদেরকে লিডার হিসাবে পরিচয় দিতো এবং এই লিডারদের আবার একেকটা ইউনিটে অনেকগুলো ঘর ছিল, যেগুলোতে নিজেরা না থেকে শুধু ভাড়া দিয়েই অনেক টাকা উপার্জন করতো। ক্ষমতা (রাষ্ট্রের) বদলের সাথে সাথে ক্ষমতাসীন দলের সমর্থক দলটি ক্ষমতার শীর্ষে (বস্তির) চলে যেতো। কৌতুহলোদ্দীপক বিষয় হলো বিরোধী (রাষ্ট্রের) দলের সমর্থকরা (যারা হয়ত গত বছরগুলোতে বস্তি নিয়ন্ত্রণ করতো) বিনা বাঁধায় নতুন দলের কাছে ক্ষমতা (বস্তির) ছেড়ে দিতো এরকম একটা ভঙ্গিতে – 'সামনে আবার আমরাও আসবো।'

অতীত অভিজ্ঞতার ভিত্তিতে দেখা গেছে, কল্যাণপুর বস্তির সবকিছুতে ঐ নেতাদের অসীমপ্রভাব। এই 'সবকিছু' এবং 'অসীম' এর মাত্রা যে কতটা গভীর সেটা লেখার পরবর্তী অংশে আরো পরিষ্কার হবে। তবে মজার ব্যাপার হলো সাধারণ বস্তিবাসীদের কাছে লিডার হিসাবে শুধু সাহাবুদ্দিন, রশিদ, সাত্তার (বস্তির লিডার) এদেরই পরিচিতি ছিলো। এদেরকে কারা চালাতো? আশ্রয় দিতো? এ ধরনের প্রশ্নের ক্ষেত্রে বস্তিবাসীরা নীরব থাকতো। বস্তিবাসীরা যাদেরকে বস্তির মধ্যে ক্ষমতার চর্চা করতে দেখেছে, তাদেরকেই নেতা হিসাবে মানছে- এদের পেছনেও যে অনেকে জড়িত থাকতে পারে সে বিষয়ে তেমন কোন আগ্রহ নেই এদের। আর এ পর্যায়ে এসে তথ্য পাওয়া সমস্যাজনক হয়েছে কারণ বস্তি উচ্ছেদ পরবর্তী সময়ে বস্তির নেতারা প্রায় সবাই বস্তি ত্যাগ করেছে, তাছাড়া কয়েকটি (উচ্ছেদ পরবর্তী) মারামারির ঘটনাসহ দেশের সংঘাতময় রাজনীতির কারণে, নেতা, ক্ষমতা, মাস্তানী, চাঁদা – এ ধরণের বিষয়গুলো নিয়ে কথা বলতে অনেকে আগ্রহী নয়। এরপরও প্রাপ্ত তথ্য থেকে দেখা যায়, প্রধান দু'টি রাজনৈতিক দলের স্থানীয় কমিশনার, স্থানীয় পরাজিত এমপি প্রার্থী ঐ দুইটি দলের নেতৃত্ব দিতো। অনেকের মতে বস্তির লিডাররা তাদের উপার্জনের একটা অংশ এদেরকেও দিতো।

বস্তিতে নেতা হিসাবে প্রতিষ্ঠা পাওয়ার প্রধান বিষয়টি হলো বস্তির বিচার ব্যবস্থা নিয়ন্ত্রণ করা। পঁচিশ হাজার লোক বসবাসকারী এই বস্তিতে বিভিন্ন ইস্যুতে নিজেদের মধ্যে ঝগড়া ও মারামারি হওয়া স্বাভাবিক ছিল। আর এই ঝগড়া ও মারামারির অলিখিত বিচারের ভার ছিল বস্তির নেতাদের উপর। 'যাকে পাওয়া যায় তার সাথে কথা বলা', এই পদ্ধতিতে প্রায় ৭০ জন লোকের সাথে কথা বলে যে ইস্যুগুলো পেয়েছি, সেগুলো এরকম: (১) লিডারদের একটা গ্রুপ ছিলো এরা খেয়াল রাখতো কে কোন মহিলাকে অপমান করলো, কে কোন মহিলার ঘরে ঢুকলো বা ঢোকার চেষ্টা করলো অর্থাৎ নারীঘটিত কিছু ঘটলেই ঐ গ্রুপটি নেতাদের জানাতো এবং নেতারা এর বিচার করতো এবং বস্তির সবারই একই কথা- এই বিচারের রায় সবসময় টাকার কাছে বিক্রি হয়ে যেতো। (২) বস্তিবাসীদের নিজেদের মধ্যে টাকা লেনদেন, জমিজমাসহ বাচ্চাদের ছোটখাট মারামারি থেকে বড়দের মধ্যে মারামারির বিভিন্ন ঘটনা ঘটতো এবং যথারীতি এগুলো বিচারের ভার থাকতো ঐ নেতাদের এবং রায় হতো যথারীতি টাকার জোরে। কৌতূহলোদ্দীপক ব্যাপার হলো ক্ষমতাসীন দলের পার্টি অফিস (ঐ বস্তির) অস্থায়ী কোর্ট বা বিচারালয় হিসাবে পরিচিত ছিল (বিএনপির সময়ে, আওয়ামীলীগের সময়ে), এখানেই নেতারা বিচারক হিসাবে বসতো এবং যাবতীয় বিচার সালিশ করতো। বস্তির লোকজনও ঐ পার্টি অফিসকে কোর্ট মনে করে ভয় করে চলতো। তবে বস্তিবাসীদের কাছে এই কোর্টের বিচারকদের সম্পর্কে ইমেজ ছিলো, 'টাকা দিয়েই রায় নিজের পক্ষে আনা যায়'। বস্তিতে এমনও নজির পাওয়া গেছে যে, একজন অন্যের মাথা ফাটিয়ে দিয়েছে অন্যায়ভাবে। পরে টাকা দিয়ে লিডারদের হাত করে ঐ মাথা ফাটা ব্যক্তিকেই বস্তি ছাড়া করেছে মাথা ফাটিয়ে দেওয়া লোকটি। বস্তির এই ক্ষমতা কাঠামোর শীর্ষে অবস্থান করা দলটির প্রধানের আরো কিছু কাজ ছিলো, যেমন - কেউ নতুন ঘরে উঠলে, নতুন ঘর করলে, নতুন ঘর কিনলে তাদের কাছ থেকে চাঁদা উঠানো। তবে সবসময় এই চাঁদা উঠানোর মাত্রা সমান ছিল না এবং এখানে আঞ্চলিকতা, আত্মীয়তা, ক্ষমতা – এসব বিষয় প্রভাবক হিসাবে কাজ করতো। উদাহরণ হিসাবে বলা যায়, নতুন কেউ একজন বস্তিতে আসবে তার যদি এলাকায় পরিচিত বা প্রভাবশালী অথবা আত্মীয় কেউ আগে থেকেই ঐ বস্তিতে থাকতো তবে অনেক সময় চাঁদা কম বা না দিলেও চলতো। তবে এই খাতে চাঁদার পরিমাণ অনেক ছিল বলে বস্তিবাসীরা জানায়।

অতীত অভিজ্ঞতা থেকে দেখা যায়, যখন বস্তি পুড়ে বস্তির সকল অধিবাসী গৃহহীন হয়ে যায় তখন সরকারি, বেসরকারি সকল রিলিফ বা সাহায্য বস্তির লিডারদের (তৎকালীন) মাধ্যমেই দেওয়া হয়েছে

এবং অনিবার্যভাবে সেই সময়কার বস্তিবাসীদের অভিজ্ঞতা থেকে জানা যায়, 'অর্ধেক যায় কুমিরের পেটে (লিডারের)।' ফুলকিসহ বেশ কয়েকটি এনজিও'র অভিজ্ঞতা থেকে দেখা যায়, তাদের প্রোগ্রাম, অফিসের (বস্তির) কার্যক্রম চালানোর জন্য বস্তির লিডারদের খুশি করতে হয়েছে। এমন নজিরও দেখা গেছে – পূর্বে স্থাপিত সরকারি ল্যাট্রিন স্থানীয় লিডারদের মাধ্যমে ভেঙ্গে ফেলে নিজেদের প্রোগ্রাম চালিয়ে নেবার স্বার্থে বস্তিবাসীদের জন্য ঋণ হিসেবে (কিস্তিতে) ল্যাট্রিন দেওয়া হয়েছে। বিছিন্ন কিছু ঘটনার সন্ধান পাওয়া যায় যেক্ষেত্রে মেয়ে বিয়ে দেওয়ার সময়ও লিডারদের খুশি করতে হতো। 'শো ডাউন' –লিডার (বস্তির) দের ক্ষমতা টিকিয়ে রাখার জন্য প্রধান হাতিয়ার ছিল এটা। যেমন – স্থানীয় বাংলা কলেজের দুলু (সরকারি দলের ছাত্রনেতা) এর নেতৃত্বে মাঝে মাঝে ক্যাডাররা অস্ত্র হাতে বস্তির লিডারদের পক্ষে বস্তিতে ঘুরে যেতো। সাধারণত বস্তির নেতৃত্বে চ্যালেঞ্জ আসলে এমনটা ঘটানো হতো, যেমন – ঘর দখল, বিচার সংক্রান্ত ঝামেলায় পড়লে লিডাররা এটা করতো। আবার কিছু কথা বস্তিতে প্রচলিত ছিলো যেগুলোর সত্যতা যাচাই না করেই বস্তিবাসীরা বিশ্বাস করতো এবং লিডারদের আরো ক্ষমতাবান ভাবতো, যেমন, কোন লিডারের মেয়ে জামাই কালাজাহাঙ্গীরের ডান হাত বা কোন লিডারের ছেলে ও তার বন্ধুরা বড় রংবাজ ইত্যাদি বিষয়।

এনজিও ও কল্যাণপুর বস্তি

এই গবেষণা কাজটির উদ্দেশ্য আগেই উল্লেখ করা হয়েছ। এক্ষেত্রে চেষ্টা করা হয়েছে বস্তিতে এনজিওগুলোর কার্যক্রমের ধরণ সম্পর্কে জানার ও বস্তির বিভিন্ন সমস্যায় (যেমন উচ্ছেদ) তাদের অবস্থান বা ভূমিকা কি ছিলো এবং বস্তি উচ্ছেদ পরবর্তী পরিস্থিতিতে তাদের ভবিষ্যৎ কর্মপরিকল্পনা কি তা জানা। এরই ধারাবাহিকতায় এই অধ্যায়ে কল্যাণপুর বস্তিতে কর্মরত এনজিওদের কর্মকাণ্ডের উপর কিছু তথ্য প্রদান করা হবে এবং পরবর্তী দুইটি অধ্যায়ে বাদবাকি দুইটি বিষয়ের উপর তথ্য প্রদান করা হবে। উল্লেখ্য যে, এনজিওদের এই বস্তিতে কর্মকাণ্ড জানার ব্যাপারে মূলত বস্তিবাসী ও এনজিওগুলোর মাঠকর্মীদের উপর নির্ভর করা হয়েছে। তবে অনেক ক্ষেত্রে বিস্তারিত তথ্যের জন্য এনজিওগুলোর হেড অফিসেও যোগাযোগ করা হয় ।

সারণী ১০. এক নজরে কল্যাণপুর বস্তিতে কর্মরত এনজিওসমূহ

Name of NGO/ Organization	Programme	Donor	Remarks
DSK (Dustha Shahstha Kendra)	Water & Sanitation	Plan International	
URBAN	Community Development Program, Microcredit, Urban Housing	War on Want (UK)	
SUROVI	Formal School (01)	Plan International	
GSS	School for Garments Worker's Children	(International Labour Organization, MOU)	
BRAC	Child Education	BRAC	
MARIE STOPES CLINIC SOCIETY	One Clinic (MCH)	Department for International Development Asian Development Bank	GoB
RADDA BARNEN	Clinic (MCH)	Urban Primary Health Care Project (UPHCP)	GoB
FULKI	Education	FULKI	
PROSHIKA	Microcredit, Child Education, Human Development, Sanitation, Social Mobilization, Safe Drinking Water, Disability & Development Works etc.	Department for International Development Canadian International Development Agency NORAD, European Union	
DCC (Dhaka City Corporation)	Sanitation and Sewerage	Dhaka City Corporation	GoB
SS (Safe Save)	Microcredit	Safe Save	

সূত্র: Coalition for the Urban Poor-CUP

বস্তি উচ্ছেদের আগে সেখানে মোট ১১টি এনজিও বিভিন্ন ক্ষেত্রে কাজ করছিলো (সারণী ১০)। তাদের মধ্যে কয়েকটি সংস্থা কেবল একটি বিষয়ের উপর কাজ করেছে যেমন দুস্থ স্বাস্থ্যকেন্দ্র পানি সরবরাহ ও পয়ঃনিষ্কাশন উন্নয়নে, গণ সাহায্য সংস্থা ও ব্র্যাক শিশু শিক্ষা প্রদানে এবং সেফ সেভ ক্ষুদ্রঋণ কর্মকাণ্ডে সংযুক্ত ছিলো। আরবান এবং প্রশিকা তাদের ক্ষুদ্রঋণ কার্যক্রমের পাশাপাশি অন্যান্য উন্নয়নমূলক কাজেও জড়িত ছিলো। তবে বস্তিবাসীরা সকল সংস্থার প্রতি একই পরিমাণে সন্তুষ্ট ছিলো না, যেমন- ফুলকির প্রতি বস্তিবাসীদের অসন্তুষ্টির প্রধান কারণ ছিলো, বস্তির জায়গা দখল করে অফিস স্থাপন। সাধারণভাবে দেখা গেছে যে, স্বাস্থ্য সংক্রান্ত কর্মকাণ্ডে নিয়োজিত সংস্থাগুলোর প্রতি বস্তি-

বাসীদের বিশেষ সন্তুষ্টি ছিলো 'আপারা তুলোর মতো নরম ছিলো, যা বলা হতো তাই শুনতো, ব্যবহার খুব ভালো ছিলো।'

অপরাধ

বর্তমান পৃথিবীতে অপরাধের বিভিন্ন মাত্রা আছে। হতে পারে সেটা আন্তর্জাতিকভাবে দেশ দখল, কিংবা একটা দেশের প্রেক্ষাপটে মানুষকে আত্মপক্ষ সমর্থনের সুযোগ না দিয়ে হত্যা করা, চোরাচালান অথবা খুন, ডাকাতি। কিন্তু বর্তমান প্রেক্ষাপটে বিভিন্ন প্রচার-প্রচারণায় বস্তির সাথে মাদক ব্যবসা এবং পতিতাবৃত্তিকে মিলিয়ে দেখার চেষ্টা করা হয়, এপর্যায়ে কল্যাণপুর বস্তির এই দুইটি বিষয় নিয়ে আলোচনা করছি:

- বস্তিতে আমার উত্তরদাতাদের প্রায় সবার সাথে অন্যসব কথার পাশাপাশি ড্রাগস বা মাদক বিষয়ে কথা বলেছি। তারা সবাই বলেছেন বস্তিতে গাঁজার বাইরে অন্যকিছু বিক্রি হতো না। কেউ ইচ্ছা করলেই এখান থেকে গাঁজা সংগ্রহ করতে পারতো। চিহ্নিত কিছু লোকজন এই ব্যবসার সাথে যুক্ত ছিলো।
- আমিসহ ৬ জনের আড্ডা, সবার হাতে গাঁজার স্টিক (আমি ছাড়া), স্থান- কল্যাণপুর উচ্ছেদকৃত বস্তির মসজিদের পাশের পলেথিন ঝুপড়ি ঘর। আড্ডার মধ্যমণি ফারুক ভাই ওরফে গরীবুল্লাহ ওরফে গুরুসহ আরো কয়েকজন। আড্ডার বিষয় নির্ধারণ করছি আমি। এটা করাও বেশ সহজ, কোন একটা বিষয়ের আলোচনা তুলে দিলে সেটা নিয়ে ব্যাপক কথা চলছে-

গুরু: 'আমরা মারকোসা (মাকড়সা), মালিক দালান ফেলে রাখলে সেখানে মারকোসা বাসা বান্ধে। আবার দালান যখন মালিকের দরকার হয় তখন এসে মারকোসার বাসা ভেঙ্গে ফেলে। তেমনি সরকারি জায়গায় আমরা বস্তিবাসীরা মারকোসা হিসাবে ছিলাম, এখন সরকারের এই জায়গা দরকার তাই এই মারকোসার (বস্তিবাসীর) বাসা ভেঙ্গে দিছে।'

মকিম: 'আমরা এই দেশের মানুষ না? আমাগো অধিকার নাই? আমাগো ভোট নাই? মারকোসারও জীবন আছে, না কি? আমাগো কি মানুষের জন্ম না?'

গুরু: 'বেশি কথা কয়ন টিক না।'

দিদার: 'না, আমাগো জন্মে দোষ আছে, যুদ্ধের সময় ৩০ কোটি (উনি কোটি বলেছেন) মা, বোন বীরঙ্গনা হইছিল (উনি এই শব্দটি ব্যবহার করেন) ঐ মা, বোনদের মধ্যে আমাগো সবার মা ছিল, হি..হি..হি..হি..।' (সবাই হি.. হি.. করে হাসতে থাকে)

আমি: 'কিন্তু গুরু, বস্তি ভাঙ্গলো কেন ?'

গুরু: 'বেশি কথা কয়ন টিক না, কিন্তু লোক হইলো দুই প্রকার (১) আল্লাহর বান্দা (২) চুগোলখোর (লিডার), এই চুগোলখোর লোক বেড়ে গেছিল বস্তিতে এরা নিজেদের পোন্দে নিজেরা গোচ হানদাইচে।'

মাজেদ: 'বস্তি তো ভাঙ্গবেই, ক্ষমতায় গেলে আমাদের কথা সরকারের আর মনে থাকে না, কোন মায়া নেই, বস্তি তো অনেক ছোট ব্যাপার।'

গুরু: 'বেশি কথা কয়ন টিক না।'

(ততক্ষণে নেশা জন্মে উঠেছে, সবার চোখ লাল (আমি ছাড়া) একটার পর একটা স্টিক (গাঁজার) শেষ হচ্ছে, কে কয়বার খারাপ পাড়ায় গেছে সে আলোচনাও চলে আসছে)

গুরু: 'মামুন ভাই, একটা টান দেন।'

আমি: 'বুকে সমস্যার কথা বললাম। ডাক্তার টানতে নিষেধ করেছে। গত মাসে ছেড়ে দিয়েছি, আগে খেতাম। এখন শুধু সিগারেট খাই।'

গুরু: 'বেশি কথা কয়ন টিক না।'

আমি: 'গুরু বস্তির গান্‌জা, ডালের সিসটেম কি ছিলো?'

জমজমাট আলোচনা হলো এ বিষয়ে। কল্যাণপুর বস্তির ড্রাগ বিষয়ক যেসব কথাবার্তা জানা গেলো, তার মূল কথা হলো: (১) গাঁজা ছিল এই বস্তির একমাত্র প্রচলিত ড্রাগ, অন্য কোন ড্রাগ বিক্রি হতো না। (২) বস্তির ফকাপাগলা ছিলো প্রধান গাঁজা বিক্রেতা। (৩) জটাবুড়ি, কচির বউসহ আরো ৭/৮ জন মহিলা বিক্রেতা ছিল বস্তিতে, এরা শরীরের মধ্যে সবসময় গাঁজা রাখতো বিক্রির উদ্দেশ্যে। (৪) ৬/৭ জন পুরুষ বিক্রেতাও ছিল। তাছাড়া টং দোকানে গাঁজা পাওয়া যেতো। (৫) গাঁজা আসত কাওরান বাজার থেকে ৩ থেকে ৪ হাজার টাকা কেজি কিনে এনে ১০-২০ টাকার পুঁটলি (ভাগ) করে বিক্রি করতো বিক্রেতারা। (৬) গাঁজার প্রধান কাস্টমার ছিল, বস্তির তথা আশেপাশের লোকজনই, বাইরের জানা শোনা কিছু গ্রুপ মাঝে মধ্যে আসতো। (৭) পুলিশের বিষয় ছিল এমন যেন 'রানিং পুলিশ' এরা, ডিউটিতে আসতো আর বিক্রেতারা (গাঁজা) সামনে পড়লে ২০-৩০ টাকা করে দিতো হতো। আবার হঠাৎ গাড়ির পুলিশ আসতো, এরা সুযোগ মতো পেলে কয়েকজনকে গাড়িতে করে ধরে নিয়ে যেতো, পরে টাকা নিয়ে ছেড়ে দিতো। (৮) মদ বা হেরোইন বিক্রির চেষ্টা যে বস্তিতে করা হয়নি তা নয়, ৫ থেকে ৬ বছর আগের দুইটি ঘটনা এক্ষেত্রে উদাহরণ হিসাবে উল্লেখ করা যায়। একজন বস্তিতে ঘর কিনে মদ বিক্রি করতে শুরু করে তখন বস্তির অনেক লোক মিলে ঐ লোকটিকে ধরে পিটায়, তারপর তার ঘর বিক্রি করিয়ে স্ট্যাম্পে সই করানোর পরে তাকে (তাকে যেন আর এই এলাকায় না দেখা যায় এই অঙ্গীকারনামা) এলাকা ছাড়া করা হয়। একইভাবে ঐ ঘটনার কিছুদিন পর আরেক লোক হেরোইন বিক্রি করা শুরু করলে, তাকেও একইভাবে বস্তির লোক এলাকা ছাড়া করে। (৯) ঐ গাঁজা বিক্রেতাদের ক্ষেত্রে দেখা যায় যে, পুরো পরিবার এই গাঁজা বেচাকেনার সাথে যুক্ত, যেমন- জটাবুড়ির জামাই, ছেলেমেয়ে, সবাই মিলে গাঁজা বিক্রি করতো। আবার বাচ্চু ও তার বউ পরিবারসহ গাঁজা বিক্রি করতো।

স্থানীয় একটি এনজিও'র কর্মীদের সাথে ভালো যোগাযোগ ছিলো। দীর্ঘদিন ধরে এরা বস্তি এলাকায় রয়েছে এবং সবাই মহিলা। তাঁদের প্রত্যেকের কাছে আমি আলাদাভাবে ড্রাগ বিষয়ে (কল্যাণপুর বস্তি-র) জানতে চাই। সবার কথার মধ্যে কিছু মিল খুঁজে পাই (ক) বস্তিতে গাঁজা চলতো, 'বিক্রি করতো, অনেকেই খাইত'। (খ) অন্য কোন ড্রাগ বস্তিতে পাওয়া যেতো না। (গ) নাজু নামে একজন কর্মী বলেন, 'আরজিনা'র (আরেক জন কর্মী) ছেলে বস্তির রিনার কাছ থেকে হেরোইন কিনে খাইতো। এ পর্যায়ে আমি 'আরজিনা'র সাথে কথা বললে তিনি বলেন, 'আমার ছেলে নেশা করতো একথা ঠিক তবে শুধু গাঁজা, বস্তিতে রিনার কাছে গাঁজা ছাড়া অন্য কিছু পাওয়া যেতো না'। আমার আগ্রহ ছিলো রিনার সাথে কথা বলার, কিন্তু সে বস্তি ভাঙ্গার পরপরই এলাকা ত্যাগ করে চলে গেছে। এর বাইরেও বস্তিতে

কর্মরত অন্যান্য এনজিও কর্মীদের সাথে কথা বলেছি উনারাও প্রাপ্ত তথ্যের বাইরে নতুন কিছু জানেন না। কল্যাণপুর বস্তি এলাকায় অনেকটা সময় কাটানোয় আমার কিছু শিশু বন্ধু জুটে যায়। দশ টাকা ঘন্টা চুক্তিতে এইসব শিশু বন্ধুরা ছোট সাইকেল চালিয়ে বেড়াতো কয়েকজন আবার বিড়িও খেতো। এদেরকে আমি গোয়েন্দা কাজে নিয়োগ করেছিলাম। তারা- তাদের বাড়ির লোকজন, বাবা মা বা অন্য সবার সাথে কথা বলে – ড্রাগ সংক্রান্ত তথ্য আমাকে জানাবে, দুইদিন পর সবাই একই তথ্য নিয়ে হাজির হয় – 'গাঁজার বাইরে কিছু বিক্রি হইতো না'।

'বস্তির যৌন ব্যবসা' বিষয়টি বোঝার জন্য প্লান ইন্টারন্যাশনালের জনাব প্রকৃতির সাহায্য নিয়ে এগুতে হয়, কারণ তিনি পূর্বে ঐ বস্তিতে এ সংক্রান্ত কাজ করেছেন। বস্তি উচ্ছেদ হয়ে যাওয়ায় এবং সবাই স্থান ত্যাগ করায়- এখনও টিকে থাকা খাদিজা এবং হাসির সাথে কথা বলি। যৌনকর্মী হিসাবে বস্তিতে এদের স্বীকৃতি রয়েছে।

বিভিন্ন উৎস থেকে প্রাপ্ত তথ্যের আলোকে নিচের বিষয়গুলো স্পষ্ট হয়ে উঠে: (১) সব মিলিয়ে বস্তির ১২ জনের মতো মহিলা এ ব্যবসার সাথে জড়িত ছিল তাদের সবাইকে এরা দুইজন চিনতো। (২) খুব গোপনে হঠাৎ দুই-একজন করে কাস্টমার বস্তিতে এসে সময় কাটাতো। তবে সবাই বস্তিতে কাস্টমার আনতো না এবং নিয়মিত তো নয়ই। (৩) বস্তির রুকসি খালা পাশের মহল্লায় একটা ফ্ল্যাট ভাড়া নিয়েছিল। এখানে বস্তির কাস্টমাররা গিয়ে সময় কাটাতো (সংখ্যায় খুব কম)। (৪) পল্টনের নাভানা, সাগরিকা ধরনের কিছু হোটেল ছিলো যেখানে কাস্টমার পাওয়া যেত। (৫) মাঝে মাঝে সুমনের মতো স্থানীয় (পাইকপাড়ার) 'গুণ্ডা' এদেরকে উঠিয়ে নিয়ে গিয়ে বিনামূল্যে বা নামমাত্র মূল্যে সময় কাটাতো। (৬) পিচ্চিকামাল ও নাগর আলীর মতো লোকজন (বস্তির লিডার) ছিল যারা এদের কাছ থেকে মাসে ৫০০ টাকা থেকে ৬০০ টাকা পর্যন্ত জোর করে নিতো, টাকা না দেওয়ায় পিস্তল ঠেকিয়ে ছিল 'খাদিজা'কে একবার। (৭) রুকসি খালা কাস্টমারদের দেয়া টাকার অর্ধেক রেখে দিতো। এছাড়া কাস্টমারসহ হোটেলে গেলে প্রায় অর্ধেক টাকা তাদেরকে দিয়ে আসতে হতো।

কয়েকজন আলোচিত ব্যক্তি

কল্যাণপুর বস্তির আলোচিত ব্যক্তিদের সন্ধান করতে গেলে দেখা যাবে কয়েকজন ব্যক্তি আছে যারা সবসময়ই আলোচিত, যেমন – এমএ জামান, শফিকুল ইসলাম প্রমুখ। আবার কিছু আলোচিত চরিত্র আছে যারা পরিবর্তনশীল অর্থাৎ নির্দিষ্ট ঘটনাকে কেন্দ্র করে আলোচিত, এখানে ব্যক্তির নামের চেয়ে ঐ ঘটনায় যুক্ত মানুষই বড় হয়ে দেখা দেয়। এই গবেষণা কাজের অংশ হিসাবে ঐসব আলোচিত ব্যক্তি বা ঘটনার সন্ধান করার চেষ্টা করেছি।

ফরমার

বস্তিবাসীদের কাছ থেকে পাওয়া তথ্যানুযায়ী বস্তির মধ্যে 'ফরমার'রা বিশেষভাবে চলাফেরা করে এবং বস্তিবাসীরাও তাদেরকে অন্যভাবে দেখে। 'ফরমার' হলো পুলিশের তথ্যদাতা (ইনফরমার) বা পুলিশকে যে বিভিন্ন বিষয়ে তথ্য দেয়। বস্তির মধ্যে কেউ একবার ফরমার হিসাবে পরিচিতি পেয়ে গেলে তার আর সুবিধার শেষ নেই, বস্তির লোকজনও ভেবে দেখার চেষ্টা করে না আসলেই সে 'ইনফরমার' কি না। এরা (ইনফরমার) সাধারণত সব সময় ভালো জামা কাপড় (ইন করে) পরে

থাকতো, রোদে চশমা পরতো (রাতের বেলাও) এবং হাতে সবসময় মোবাইল রাখতো (পকেটে নয়)। এদের ঘরে থাকতো রঙিন টিভি, দামি আসবাব। এরা বস্তির একটু অবস্থাশালী ব্যবসায়ীদের কাছ থেকে বিভিন্ন সময় ভয় দেখিয়ে টাকা উঠিয়ে নিতো চাঁদা হিসাবে (পুলিশে ধরিয়ে দেওয়ার ভয়)। সাধারণত বস্তির দোকানগুলোতে এরা 'ফাউ খাইতো' (খেয়ে টাকা দিত না)। এসব কাজে কেউ বাঁধা দিতে এলে পুলিশ দিয়ে ধরিয়ে দেওয়ার ভয় দেখাতো, কখনও কখনও ধরিয়েও দিত। দেশে সরকার বদলের সাথে এদের চেহারা বা নামগুলোর শুধু পরিবর্তন হতো কিন্তু কাজ একই থাকতো। বস্তিবাসীরা এদেরকে খুবই ক্ষমতাবান হিসাবে চিহ্নিত করে এবং এদের সম্পর্কে বলে, 'এরা (ইনফরমার) নিয়মিত থানায় যায়, পুলিশের সাথে চা-নাস্তা খায়।'

খাজা বাবার লোক

বস্তিতে কিছু লোক ছিলো যারা প্রায় সারা বছর সাধারণভাবে চলাচল করতো। বিড়ি, গাঁজা খেতো কিন্তু বছরের একটা নিদিষ্ট সময় হঠাৎ করে দাঁড়ি রাখতো, পাঞ্জাবি গায়ে দিত, মাথায় টুপি দিতো। এই কয়েকজন লোককে দাঁড়ি রাখতে দেখলেই বস্তির ব্যবসায়ীরা আতঙ্কে থাকতো কারণ- কখন আবার টাকা নিতে আসে, তেমনিভাবে বস্তির সাধারণ লোকজনও ভয়ের মধ্যে থাকতো ঐ লোকগুলোর হঠাৎ ভাল হওয়া দেখলে (মাথায় টুপি, মুখে দাঁড়ি)। ঐ লোকগুলোর এই হঠাৎ ভাল মানুষ হবার উদ্দেশ্যে ছিল, 'বড় একটা হাঁড়ির মুখে লাল কাপড় বেঁধে, খাজা বাবার উরস হবে তাই সবার কাছ থেকে ছাদগা তোলা'। তবে এই ছাদগা তোলার ধরণ মোটেই নিরীহ কোন বিষয় ছিলো না কারণ এরা বলতো, 'উমুকের ব্যবসা ভাল উমুক ৫০০ টাকা, উমুক ৪০০ টাকা দিবে, একইভাবে বস্তিবাসীদের কাছেও জোর করতো, উমুক হাফ কেজি চাল, উমুক ১৫ টাকা দিবে। আর একথা সবারই জানা ছিল যে, এদেরকে চাহিদা মতো টাকা না দিলে পরবর্তীতে বস্তিতে এদের অত্যাচারে ব্যবসা ও বসবাস করা কঠিন হবে। খাজাবার ভক্ত হিসাবে এরা এসব কাজ করে খুব খুশি ছিলো। কৌতূহলোদ্দীপক ব্যাপার হলো সরকার বদলের সাথে সাথে খাজাবাবার ভক্তদের মুখগুলোর কেবল (এক গ্রুপ গিয়ে, অন্য গ্রুপ আসতো) পরিবর্তন ঘটতো, কাজ থাকতো একই।

কারেন্ট কমিটি

সরকারি আইন অনুযায়ী যেসব শর্তপূরণ করে বাড়িতে বিদ্যুৎ সংযোগ নিতে হয়, সেগুলো স্বাভাবিকভাবেই বস্তিবাসীদের থাকে না। এজন্য আইনের ফাঁক-ফোকর ও ঘুষ দিয়ে, অবৈধভাবে বিদ্যুৎ সংযোগ নেয়া হয় কল্যাণপুর বস্তিতে। বস্তিতে একটি কমিটি ছিল যারা কেন্দ্রীয়ভাবে বস্তি বাসীদের কাছ থেকে বিদ্যুৎ বিল উঠাতো। এই কমিটিতে যারা থাকতো তাদেরকে বস্তিবাসীরা কারেন্ট কমিটি হিসাবে চিহ্নিত করতো এবং বস্তির সবাই জানতো লাইট প্রতি ১০০ টাকা বিল হিসাবে এরা উঠায়। অথচ এই টাকার অর্ধেকও সরকারি কোষাগারে জমা দেয় না। বস্তির লোকদের কাছে লোভনীয় একটা জায়গা ছিল ঐ কমিটি। যথারীতি ক্ষমতাবদলের সাথে সাথে কমিটির মুখগুলোরই শুধু পরিবর্তন হতো কাজ একই থাকতো।

এতিমখানা – টাকার খানা

কল্যাণপুর বস্তির মধ্যে একটা বড় এতিমখানা ছিল। এর ম্যানেজিং কমিটির সভাপতি পদটি ছিল বস্তির মধ্যে আলোচিত চরিত্রের একটি। ক্ষমতার পালাবদলের সাথে সাথে সভাপতি পদটির জন্য শুরু হয়ে যেতো তোড়জোড়। এতিমখানার সভাপতিকে বস্তিবাসীর সবাই টাকাওয়ালা ও ক্ষমতাবান হিসাবে দেখতো। কারণ টাকা, চাল, কোরবানীর চামড়াসহ বিভিন্ন সরকারি, বেসরকারি সাহায্য আসতো ঐ কমিটির কাছে। ঐসব মালপত্রের হিসাব রাখা ও খরচ করার একমাত্র এখতিয়ার রয়েছে ঐ ম্যানেজিং কমিটির।

ভাঙ্গারীর ব্যবসা ও দালালি

বস্তিতে (কল্যাণপুর) আরেকটি আলোচিত বিষয় ছিল 'দালাল'। বস্তির অনেক লোকজন ভাঙ্গারী ব্যবসার সাথে জড়িত ছিল। আর এই ব্যবসার সাথে ছিল বস্তির চোরদের একটা চমৎকার চেইন বা যোগাযোগ। ঘটনাটি এমন, 'পুরানো কৌটা, টিন টোকানোর নামে বস্তির অনেক লোকজন বস্তির আশপাশের এলাকা থেকে মানুষের অনেক গুরুত্বপূর্ণ জিনিস এমনকি বস্তিবাসীরও অনেক জিনিস চুরি করে আনতো এবং ঐ সব ভাঙ্গারীর দোকানে বিক্রি করে দিতো।' তখনই ঘটনার আলোচিত চরিত্র হিসাবে দালালরা সামনে চলে আসে অর্থাৎ প্রকৃতমালিক (যারা এই চেইন জানে) যদি ঐ চুরি হয়ে যাওয়া প্রয়োজনীয় জিনিস ফেরত পেতে চায় তাহলে ঐ দালালদের মাধ্যমে এগুতে হতো এবং বেশিরভাগ সময় দালাল, মালিকের কাছ থেকে কিছু টাকা নিয়ে ঐ জিনিস উদ্ধার করে দিতো (চোর এবং ভাঙ্গারীর দোকানদারকে কিছু টাকা দিয়ে)।

বস্তির রাজা, রাজ্য ও রাজারনীতি

সমস্ত বস্তিবাসীর কাছে এমএ জামান (সভাপতি, বাস্তহারা সমাজ কল্যাণ সমিতি-সেবা সংঘ) খুবই জনপ্রিয়। তিনি জনপ্রিয়তার শীর্ষে অবস্থান তো করতেনই, সাথে বস্তিবাসীরাও তাদের অনেক গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ের সিদ্ধান্ত নেওয়ার ভার তার উপর ছেড়ে দিতেন। প্রাপ্ত বিভিন্ন তথ্য থেকে দেখা গেছে, তিনি ঐ বস্তির রাজা হিসাবে বেশ সুন্দরভাবে তার রাজ্য পরিচালনা করতেন, কারণ রাজনীতিতে তিনি বেশ দক্ষ। এই গবেষণাপত্রের পরের দিকে এই বিষয়ে আরো তথ্য থাকবে।

শফিকুল ইসলাম (ছদ্ম নাম)

শফিকুল ইসলাম হলেন কল্যাণপুর House Building Research Institute (HBRI) এর পরিচালক। বেশ কয়েকবার চেষ্টা করেও তার সাথে কথা বলতে পারিনি। বস্তিবাসীদের কাছে তিনি খুবই আলোচিত ব্যক্তি কারণ বস্তি উচ্ছেদের প্রধান ইন্ধনদাতা হিসাবে সবাই তাকে চিহ্নিত করে থাকে।

ফকা পাগলা

এই বস্তির গাঁজা বিক্রির নেতা (সেবনকারীও বটে) ফকরুদ্দিন ওরফে ফকা পাগলা আলেচিত চরিত্রগুলোর একটি। বস্তি উচ্ছেদের পরদিনই তিনি কল্যাণপুর এলাকা ত্যাগ করেন। দুইদিন চেষ্টার পর তার পরিচিত একজনের কাছে থেকে বর্তমান ঠিকানা সংগ্রহ করি। জানতে পারি সাভার হেমায়েতপুর থেকে ২০/২২ কিলোমিটার দূরে বাস্তা বাজারে নেমে, ভ্যানে করে ধল্লাবাজারে গিয়ে পায়ে হেঁটে উনার বাড়িতে (বর্তমান) যেতে হয়। সন্ধ্যার পর ছাড়া তাকে বাড়িতে পাওয়া যায় না এবং সবার সাথে কথাও বলেন না। আমার প্রধান তথ্যদাতাদের একজন পরামর্শ দেন শিল্পী আপাকে (স্থানীয় এক এনজিও কর্মী, তাঁর সাথে আমার পরিচয় ছিল) নিয়ে যান, আপাকে ফকা পাগলা মেয়ে বলে ডাকে, তাকে নিয়ে গেলে কাজ হবে। ঢাকায় ফিরতে অনেক রাত হবে, পথ চিনি না, সাথে 'শিল্পী' আপা থাকবে – এ ধরনের অনেক চিন্তা মাথার মধ্যে থাকলেও একদিন সন্ধায় ঠিকই রওয়ানা হই। পায়ে হেঁটে যখন তাঁর বাড়িতে পৌছলাম তখন ৮টা বাজে। নিজেকে তিনি বঙ্গবন্ধুর গাড়ির ড্রাইভার হিসাবে পরিচয় দেন। মুক্তিযুদ্ধ করেছেন, মুজিব তাকে সরকারি বাড়ি দিয়েছিলো, জিয়া সেটা কেড়ে নিছে। তিনি বলেন, 'লা হাউলা' কইলে আগে শয়তান দৌড় দিত, বর্তমানে কাছে এসে বসে, কোরানের অ্যাকশন কমে গেছে এ ধরণের আধ্যাত্মিক কথাও বলেন। শিল্পী আপা পরিস্থিতি স্বাভাবিক করে দেন, আস্তে আস্তে ফকা পাগলা কথা বলতে শুরু করেন। তিনি দুঃখ করে বলেন, 'আজরাইল ফেরেশতা ছুটিতে, তাই দোষী লোকজনও পার পেয়ে যাচ্ছে, এজন্য আমার উপর এত কষ্ট।' তিনি নিজেকে গাঁজা সেবনকারী হিসাবে স্বীকার করে বলেন, 'গাঁজা খেয়ে মসজিদ পর্যন্ত বানাইলাম। গাঁজা বিক্রেতা হিসাবে পরিচয় দিতেও তিনি চিন্তিত নন বরং জানান 'পুলিশ আমার কাছ থেকে গাঁজা খেয়ে যায়।' বস্তির ড্রাগ ব্যবসা বিষয়ে যখন আমি নির্দিষ্ট করে জানতে চাই তখন তিনি বলেন, 'আমি উনপঞ্চাশ বছর ধরে গাঁজা খাই, আমার ২টি বউ, ২২ টি ছেলেমেয়ে, আমি জানি, নেশার মধ্যে বস্তিতে একমাত্র গাঁজা বিক্রি হইতো, আর কিছু না।' তিনি আরো জানান ৮ নম্বর বস্তিতে ধলা মিয়া একবার চেষ্টা করেছিল মদ বিক্রির, সবাই তাকে উচ্ছেদ করে। এসব কিছুর বাইরে তিনি কল্যাণপুর বস্তির ড্রাগ ব্যবসা সম্পর্কে কিছু তথ্য দেন। কোথা থেকে গাঁজা আসতো, কয়টি পরিবার এর সাথে (ঐ আড্ডার তথ্যের সাথে মিলে যায়) যুক্ত ছিল এবং পুলিশের বিড়ম্বনা কি ধরণের ছিলো। সবশেষে, তিনি দেশের সব খারাপ মানুষকে সাবধান করে বলেন, 'আজরাইল যেহেতু ঘুষ খায় না, সেহেতু সাবধান, সবার বিচার হবে।'

উচ্ছেদপর্ব – কল্যাণপুর বস্তি

প্রায় ২৫ হাজার লোক বসবাসকারী কল্যাণপুর বস্তি যেদিন উচ্ছেদ হয় সেদিন বিভিন্নজন বিভিন্নভাবে নিজ নিজ ভূমিকা পালন করে। উচ্ছেদ হয়ে যাওয়া বস্তিবাসীরা এখনও নিজেদের মধ্যে এ নিয়ে আলোচনা ও সমালোচনা করে, 'বস্তি ভাঙ্গার দিন কে কি করেছিল, কে কে বেইমানী করেছিলো, কি কি করলে বস্তি উচ্ছেদ ঠেকানো যেতো, নিজেদের ভূমিকা কি হওয়া উচিত ছিলো ইত্যাদি বিষয় নিয়ে?' বস্তি উচ্ছেদের দিন কে কোন ভূমিকায় ছিল? কিভাবে উচ্ছেদপর্ব সম্পন্ন হয়েছিল? এই বিষয়গুলো যদিও এই গবেষণার অংশ কিন্তু যেহেতু উচ্ছেদপর্ব সরাসরি পর্যবেক্ষণ করা সম্ভব হয়নি, সেহেতু উচ্ছেদকালীন সময়ে ঐ স্পটে উপস্থিত বস্তিবাসী থেকে শুরু করে স্থানীয় লোকজন, দোকানাদারসহ বিভিন্ন এনজিওদের সাথে কথা বলার মাধ্যমে প্রাপ্ত তথ্যের উপরই পুরোপুরি নির্ভর করতে হয়েছে।

প্রাপ্ত তথ্য থেকে দেখা গেছে, বস্তি উচ্ছেদের দিন বিভিন্ন শ্রেণীর বা পরিচয়ের লোকজনের ভূমিকাগত কিছু পার্থক্য ছিল। যেমন, এনজিও কর্মীদের ভূমিকার সাথে বস্তির লিডার কিংবা বস্তিবাসীর ভূমিকা মেলে না।

কয়েক বছর পরপরই বস্তি ভেঙ্গে দেওয়া হবে এমন একটা গুজব ওঠে, বস্তিবাসীরা অনেকে এটাকে 'কিচ্ছা' বলে বর্ণনা করে থাকেন, কারণ নোটিশ দেয় বস্তি ভাঙ্গার, মাইকিং করে বস্তি ভাঙ্গা হবে, কিন্তু শেষ পর্যন্ত ভাঙ্গা হয় না – অনেকে এই প্রক্রিয়াকে রাখাল আর বাঘের গল্পের সাথে তুলনা করেছেন কারণ রাখাল, 'বাঘ এসেছে – এটা মিথ্যা করে বারবার বললেও একবার সত্যি সত্যিই বাঘ আসলে কেউ সাহায্য করতে এগিয়ে আসে না' তেমনিভাবে এবারও বস্তি ভাঙ্গার নোটিশ এবং ১৯/১২/২০০৩ তারিখ বিকালে মাইকিং করলেও অনেকে বিশ্বাস করে না যে, আসলেই বস্তি ভাঙ্গা হবে।

বস্তি যদি ২০/১২/২০০৩ তারিখে ভাঙ্গে আমরা কিভাবে ঠেকাবো – এমন একটা ধারণা মাথায় নিয়ে বস্তির নেতা, জাতীয়তাবাদী বস্তিবাসী সমিতি, বাস্তুহারা সমিতি এবং সাধারণ লোকজন (বস্তির) মিটিং এ বসেন। মিটিং-এর নেতৃত্ব দেন বাস্তুহারা সমিতির সভাপতি এমএ জামান। ঐ মিটিং এ উপস্থিত লোকজনের মতে ঐ দিন সবাই 'নায়ক'দের মত কথাবার্তা বলেন, যেমন, 'মরতে তো সবাইকে একদিন না একদিন হবেই, দরকার হলে কালই মরব, বুলডেজারের সামনে যাবো তাও বস্তি ভাঙ্গতে দিব না।' আরেকজন বলেন, '১০ বছর আগেই অ্যাকসিডেন্ট করে প্রায় মরণের মুখ থেকে ফিরে এসেছি এখন দরকার হলে বুলডেজারের সামনে জীবন দিয়ে দিব তবুও ভাঙ্গতে দেব না।' এধরনের অনেক কথাবার্তার পর এমএ জামানের নেতৃত্বের উপর সবাই আস্থা রেখে ঠিক করে পরের দিন সকাল থেকে (যেদিন বস্তি ভাঙ্গার কথা) সবাই বস্তিতে অবস্থান গ্রহণ করবে। সবশেষে, সবাই মিলে শপথ নেয় যে কোন মূল্যে বস্তি রক্ষা করবো।

সকাল থেকেই ২১/১২/২০০৩ তারিখে ১৫০ থেকে ২০০ বস্তিবাসী, বিভিন্ন এনজিও'র প্রতিনিধি, এমএ জামান সাহেবের নেতৃত্বে বস্তিতে অবস্থান করে। অন্যদিকে বিপুল সংখ্যক পুলিশ, আনসার এবং ম্যাজিস্ট্রেট ও House Building Research Institute (HBRI) এর লোকজন, সাথে দুইটি বুলডোজার। কিন্তু সংগঠিত বস্তিবাসীর সামনে এরা অসহায়। কারণ এমএ জামান সাহেব বস্তিবাসীদের নিয়ে সমাবেশ, বক্তৃতা করছেন, সবাইকে তিনি সংগঠিত করছেন, বলছেন, 'কেউ চলে যাবেন না', 'বস্তি ভাঙ্গতে দেওয়া হবে না', 'বুলডোজার আগে আমার শরীরের উপর দিয়ে যাবে তারপর বস্তির'। বড়ধরনের গোলমালের আশঙ্কায় বস্তি ভাঙ্গা শুরুও করতে পারছে না উচ্ছেদকারীরা। ক্রমে ১০টা, ১১টা করে বেলা গড়িয়ে দুপুর ২টা বেজে যায়, তবুও বস্তিবাসীদের সহায়তায় এমএ জামানের প্রতিরোধে বস্তি ভাঙ্গা সম্ভব হয় না। এসময় সবার কাছে বস্তি ভাঙ্গা, কোনভাবেই সম্ভব নয় বলে মনে হয়।

বিকাল ২:৩০ মিনিটের দিকে পরিস্থিতি নাটকীয়ভাবে অন্যদিকে মোড় নেয়। একজন বলেন 'যুদ্ধ ক্ষেত্রে একপক্ষের সেনাপ্রধান যদি নির্দেশ দেন 'এখন লাঞ্চের সময় হয়েছে সবাই অস্ত্র ফেলে চল খাইতে যাই, তাহলে এদের পরিস্থিতি যেমন হবে ঐদিন বস্তিবাসীদের পরিণতি ঠিক তাই হয়েছিল।' দুপুর ২টার পর থেকে জামান সাহেবের মোবাইলে বারবার ফোন আসতে থাকে (CUP-এর একজন কর্মী, যিনি ঐদিন জামান সাহেবের সাথে ছিলেন, তিনি এই তথ্য জানান) এবং একটা পর্যায়ে তিনি সবাইকে বলেন – 'অনেক বেলা হয়েছে, ক্ষুধাও লেগেছে, চলো সবাই লাঞ্চ ব্রেক-এ যাই।' এতক্ষণ সমস্যায় থাকা পুলিশ বাহিনী এবার চাঙ্গা হয়ে ওঠেন। ততক্ষণে বস্তিবাসীরা লাঞ্চ ব্রেকে (জামান সাহেবের দেওয়া) চলে গেছে। মাঠখালি পেয়ে, দ্রুত বুলডোজার ঢুকে পড়ে বস্তিতে, ভাত রেখে বস্তির লোকজন বারবার জামান সাহেবকে মোবাইল করতে থাকেন কিন্তু তিনি আর ফিরে আসেন না। বিচ্ছিন্নভাবে কয়েকজন বাধা দেওয়ার চেষ্টা করে ব্যর্থ হন কারণ পুলিশ লাঠিপেটা করতে থাকে। সুন্দর একটা শক্ত প্রতিরোধ সামান্য একটা 'লাঞ্চ ব্রেকে' নষ্ট হয়ে যায়। বুলডোজার রাউণ্ড করে সম্পূর্ণ বস্তির চারপাশের ঘরগুলো ভেঙ্গে দেয়। ভয়ে লোকজন নিজেরাই নিজেদের ঘর ভেঙ্গে ফেলে। এমএ জামান সাহেবের এই 'লাঞ্চব্রেক'কে অনেক এনজিও প্রতিনিধি, স্থানীয় দোকানদার এবং অনেক বস্তিবাসী উদ্দেশ্যমূলক, সরকারের কাছ থেকে টাকা খেয়ে করেছে এভাবে ব্যাখ্যা করেন। পরবর্তী একটা অধ্যায়ে জামান সাহেবের সাক্ষাৎকার নেওয়া হয়েছে। এই সাক্ষাৎকারের আলাপচারিতা বস্তি সম্পর্কে তাঁর অবস্থান, চিন্তাভাবনা ও স্বার্থ পরিষ্কার করবে।

যথেষ্ট সময় আগে নেটিশ না পাওয়া এবং রাতের বেলা বস্তি উচ্ছেদের ফলে সৃষ্ট ভয়াবহ পরিস্থিতি পরবর্তী অধ্যায়গুলোতে আরো পরিষ্কার হবে।

'বস্তি হলো রোম, এটা যখন ধ্বংস হয় তখন আমাদের নীরোর মতো বাঁশি বাজানো ছাড়া আর কোন উপায় ছিল না।' বস্তি উচ্ছেদের দিন কি করেছিলেন? এই প্রশ্নের জবাবে স্থানীয় সেফ সেভ এনজিও'র ম্যানেজার উপরের কথাটি বলেন, নিজেদের অসহায় হিসাবে বর্ণনা করে বলেন, 'উপর থেকে কিছু না করলে আমরা ফিল্ড স্টাফরা কি করব?' বস্তিবাসীরাও উচ্ছেদের দিনে এনজিওদের ভূমিকা দেখে খুশি নয়। অনেককে বলতে শুনেছি, 'আগেরবার বস্তিভাঙ্গতে আসলে (কয়েক বছর আগে আরেকবার বস্তি ভাঙ্গার চেষ্টা করা হয়েছিল) সব এনজিওরা মিলে বস্তিবাসীর পাশে দাঁড়ায় এবং বস্তিভাঙ্গতে বাধা দেয়, কিন্তু এবার মোনাফেকি করেছে এনজিওরা।' বস্তি উচ্ছেদের দিন এনজিওদের ভূমিকা বিষয়ে জানার

জন্য যেমন বস্তিবাসীদের সাথে কথা বলেছি তেমনি এনজিওগুলোর মাঠকর্মীসহ কর্তাব্যক্তিদেরও তথ্য সংগ্রহের মাধ্যম হিসাবে ব্যবহার করেছি।

'ফুলকি' এনজিও'র মাঠকর্মীরা জানান, 'আমরা প্রথমে বিশ্বাস করিনি যে আসলেই বস্তি ভেঙ্গে দিবে, তারপরও হেড অফিসে টেলিফোন করলে আমাদেরকে বস্তির উপর এবং অফিসের উপর নজর রাখতে বলে। আপা (কর্তাব্যক্তি) এসে উচ্ছেদের দিন সকালে বস্তি ঘুরে যায়। পরে যখন সত্যিসত্যি বস্তি ভাঙ্গতে থাকে তখন হেড অফিসে আবার জানালে অফিসের মালপত্র সাবধানে রাখতে বলে। পরে একটা ট্রাক ডেকে এনে সব মালপত্র নিয়ে যায়। আমরা বস্তি ভাঙ্গার সময় অফিসের জিনিসপত্রের কোন ক্ষতি হতে দেয়নি।' এ পর্যায়ে কথা বলি উক্ত এনজিও'র হেড অফিসের কর্তাব্যক্তির সাথে। তিনি বলেন, 'আমরা হেড অফিস থেকে ফিল্ড স্টাফদের বলে দিই- আগে আগে সব মালপত্র বের করা যাবে না, এতে করে বস্তিবাসীরা আমাদের স্বার্থপর ভাববে, যদি কিছু মালপত্র নষ্টও হয় তবুও পুরো বস্তি ভাঙ্গার পর মালপত্র বের করতে হবে। তা'হলে বস্তিবাসীরা আমাদেরকে আপন ভাববে।'

'মেরীস্টোপ' ক্লিনিকটি অনেক দিন ধরে বস্তিতে ছিল। এদের মাঠকর্মী জানান- 'আমরা আগে ধারণা করি অন্যান্য বারের মত এবারও বস্তি ভাঙ্গবে না, পরে সত্যি সত্যি ভাঙ্গা শুরু করলে হেড অফিসে ফোন করি। তক্ষুনই অফিস থেকে গাড়ি এসে ঔষুধপত্রসহ সবকিছু নিয়ে যায়।' দুইটি চেয়ারের পা ভেঙ্গে গেছে এবং ক্লিনিকের সাইনবোর্ড চুরি হয়ে গেছে বলে তারা বস্তিবাসীদের আমার সামনে 'চোর' বলে গালিও দেন।

'সুরভি' নামে শিক্ষার সাথে সংশ্লিষ্ট এনজিওটির মাঠকর্মীদের বেশ হাসি-খুশি দেখতে পাই, কারণ বস্তি উচ্ছেদের সময় তাদের তেমন কোনো ক্ষতি হয়নি। স্কুলটি ছিল ভাড়া, কর্মীরা স্কুলে থাকা অল্প কিছু কাগজপত্র এবং বসার মাদুর নিরাপদে সরিয়ে ফেলে, কিছু হারায়নি। হেড অফিসে ফোন করলেও কেউ আসেনি। তবে মাঠকর্মীরা জানায় দূর থেকে যখন তারা বুলডোজার চালানো দেখছিল তখন নাকি বস্তি-বাসীদের জন্য তাদের বেশ খারাপ লাগছিল। একইভাবে 'রাড্ডা' ক্লিনিকের কর্মীরাও কল্যাণপুর বস্তি উচ্ছেদের দিন দ্রুত ভ্যান ডেকে মালপত্র সরিয়ে ফেলার মধ্যেই তাদের দায়িত্ব পালন সীমাবদ্ধ রাখে।

'সেফ সেভ' নামের ক্ষুদ্রঋণ কার্যক্রমের সাথে জড়িত এনজিওটি কল্যাণপুর বস্তিতে অনেকদিন ধরেই তাদের কার্যক্রম চালাচ্ছিলো। এই এনজিও'র মাঠকর্মীদের সাথে যেমন কথা বলেছি, অন্যদিকে এদের কর্তাব্যক্তিদের সাথেও কথা বলে দেখেছি এদের কিছুই করার ছিল না। তাদের অফিস নিয়ে কোন চিন্তা ছিল না, কারণ তাদের অফিস বস্তির পাশের একটি ভবনে নিরাপদেই ছিল। আর সবচেয়ে বড় কথা হলো এনজিওগুলো আগে থেকে বুঝতে পারেনি বস্তি ভাঙ্গবে কিনা। এইসব এনজিও'র মাঠকর্মীরা তাদের হেড অফিসে ফোন করলে হেড অফিস থেকে কর্তাব্যক্তিরা আসে। এরপর তাঁরা বস্তি উচ্ছেদের ছবি তুলে এবং তাদের ঋণগ্রহণকারীরা উচ্ছেদ হয়ে নতুন কোন জায়গায় যাচ্ছে তার ঠিকানা নিয়েই দায়িত্ব শেষ করে।

কল্যাণপুর বস্তির আশেপাশের মহল্লাবাসীদের মধ্যে একটি বিষয় বেশ আলোচিত আর তা'হলো যে বস্তিতে থাকতো ২৫ হাজার লোক সে বস্তি উচ্ছেদের দিন মাত্র কয়েক'শ লোক সামনে আসলো? এ বিষয়ে অনেকের সাথে কথা বলেছি। এর কারণ হিসাবে সামনে এসেছে 'মালিকানা' বিষয়টি। আগের একটি অধ্যায়ে উল্লেখ করা হয়েছে যে, কল্যাণপুর বস্তিতে বেশিরভাগ পরিবার ঘরভাড়া করে থাকতো।

এরা দেখলো 'এখানেও টাকা দিয়ে থাকি উচ্ছেদ হলেও নতুন জায়গায় টাকা দিয়ে থাকবো। তাহলে কি দরকার নিজের ক্ষতি করে বুলডোজারের সামনে গিয়ে মালিকের ঘর বাঁচিয়ে?'

পুরো বস্তিবাসীদের কাছে আগ্রহের কেন্দ্রবিন্দুতে অবস্থান করছে বস্তির এতদিনের নেতারা। যারা কিনা গতবার বস্তি উচ্ছেদের চেষ্টা করার সময়ও সামনে থেকে নেতৃত্ব দিয়ে উচ্ছেদ ঠেকিয়েছিলো। এবার তারা কোথায়? বেশিরভাগ বস্তিবাসী মনে করে আগে থেকেই নেতাদের টাকা দিয়ে হাত করেছে উচ্ছেদকারীরা। এর প্রমাণ হিসাবে দুইজন নেতা বেশ আলোচিত যারা বস্তি উচ্ছেদের কয়েকদিন আগে নিজেদের ঘর বিক্রি করে এলাকা ত্যাগ করেছে। আবার কয়েকজন নেতা আশপাশে থাকলেও উচ্ছেদের দিন তেমন ভূমিকা নেয়নি- এ মতামত বস্তিবাসীসহ স্থানীয় সকলের।

উচ্ছেদের দিন আশপাশের মহল্লার লোকজন- ঝামেলা বা উৎপাত বিদায় হচ্ছে এমন একটা মানসিকতা নিয়ে চুপচাপ বসে ছিলো, 'সাময়িক ভাবে মালপত্র রাখতে চাইলেও রাখতে দেয়নি। 'মিটিমিটি হেসেছে আর মজা দেখেছে, বাধা দেওয়া তো দূরের কথা'- এ ধরনের মন্তব্য অনেক বস্তি-বাসীরই। অন্যদিকে বস্তিবাসীদের অনেককেই ঐ দিন দেখা যায় উচ্ছেদে বাধা দেওয়ার চেয়ে বস্তির ইট, টিন, নলকূপ বিক্রির জন্য বা দখলে নেওয়ার মধ্যেই নিজেদের দায়িত্বপালন সীমাবদ্ধ রেখেছে।

উচ্ছেদ পরবর্তী কল্যাণপুর বস্তি

এই গবেষণা কর্মের উদ্দেশ্যের একটি প্রধান অংশ জুড়ে ছিল উচ্ছেদ পরবর্তী বস্তির বাস্তবতা জানা। এক্ষেত্রে বিভিন্ন দৃষ্টিকোণ থেকে কল্যাণপুর বস্তির উচ্ছেদ পরবর্তী অবস্থা দেখা হয়েছে। দেখা গেছে, কিছু বস্তিবাসী এখনও বস্তিতে থেকেই টিকে থাকার চেষ্টা করছে আবার বেশিরভাগ লোকই বস্তি ত্যাগ করে নতুন ভাবে বেঁচে থাকার চেষ্টা করছে। বস্তির দিকে তাকালে কোন ভাবেই বোঝার উপায় নেই যে, এখানে এক সময় হাজার হাজার লোকজন বসবাস করতো। একদিকে ড্রেনের পানিতে সম্পূর্ণ এলাকা একাকার, অন্যদিকে ইট উঠিয়ে নেওয়া এবড়োখেবড়ো রাস্তা, বসতবাড়ির ভগ্নাংশ যা তাদের পরিত্যাক্ত জিনিস দিয়ে ঢাকা, আবার কিছু জায়গায় দেখা যায় ভেঙ্গে নেওয়া বাড়ির চকচকে ভিট (মেঝে), যেখানে হয়ত কিছুদিন আগেই বসবাস করতো কোন পরিবার, খেলা করতো বাচ্চারা- যা এখন শুধুই স্মৃতি।

বস্তি উচ্ছেদ বিড়ম্বনা

বস্তি উচ্ছেদের পর বস্তির অবকাঠামোগত অবস্থা খুবই খারাপ। যে লোকগুলো বস্তিতে এখনও টিকে আছে মানবেতর জীবন কাটাচ্ছে। এনজিওদের করা এবং ব্যক্তিগতভাবে প্রতিষ্ঠিত লেট্রিনগুলোর কোন চিহ্নই বর্তমানে বস্তিতে নাই, পুরুষ, মহিলা সবাইকে খোলা লেট্রিন ব্যবহার করতে হয় অথবা বিকল্প হিসাবে সন্ধ্যা নামার জন্য অপেক্ষা করতে হয়। সন্ধ্যার পর মহিলাদের বদনা হাতে বের হয়ে আসতে দেখা যায় কারণ দিনের বেলায় ঐ খোলা জায়গায় কেউ বাধ্য না হলে লেট্রিন করতে আসে না। অন্যদিকে, ঐ চট ও পলেথিনের তৈরি লেট্রিন মহিলাদের জন্য ব্যবহার করা বিব্রতকর। পুরো বস্তির মধ্যে এনজিও এবং সিটি কর্পোরেশনের সহযোগিতায় প্রত্যেক রো'তে একটি করে পানি ধরে রাখার জায়গা ছিলো – বস্তিভাঙ্গার সময় সেটার ঢাকনা লোকজন নিয়ে গিয়েছে, পানির পাইপ পর্যন্ত খুলে নিয়ে গেছে। পুরো বস্তিতে বর্তমানে দুইটি পানির জায়গা ছাড়া বাকি সবগুলো অকেজো অবস্থায় রয়েছে ফলে ঐ দুইটি জায়গায় পানির জন্য সুদীর্ঘ লাইন পড়ে। সবচেয়ে সমস্যার ব্যাপার হয় দুপুর বেলায় যখন মহিলারা গোসল করতে আসে। আমি অনেকদিন লক্ষ্য করেছি মহিলারা ঐ খোলা জায়গায় বিব্রতকর অবস্থায় জড়সড় হয়ে গোসল করছে। রাতের বেলা বস্তির দিকে দূর থেকে তাকালে চোখে পড়ে দূরে দূরে হ্যারিকেন অথবা কুপি জ্বলছে-এক সময় যেখানে বিদ্যুতের আলো ছিল সেখানে এখন অন্ধকার। মর্জিনার মত অনেকের সাথে কথা হয়েছে যাঁরা বিদ্যুৎ না থাকাকে প্রধান সমস্যা হিসাবে বর্ণনা করেছেন, 'মনে হয় কবরের মধ্যে আছি একটু গানও শোনা যায় না।'

কিছু লোকজনের সাথে আমার কথা হয় যারা এই (উচ্ছেদ) অবস্থাকে পেটে লাথি মারার সাথে তুলনা করে। এই ক্ষতিকে কোনভাবেই মেনে নিতে পারেনি, তাদের মতে 'মাত্র কয়েক মাস আগে সারা জীবনের সঞ্চয় দিয়ে মাথা গোঁজার জন্য বস্তিতে ঘর কিনেছিলাম।' অনেকে বলে, 'মাত্র গত মাসে লোন করে ঘর ঠিক করেছিলাম, ঘরে রং করেছিলাম, কারেন্টের কাজ করেছিলাম এখন সবশেষ।'

এদের সবারই এককথা, আর কয় মাস আগে ভাঙ্গলেই তো আর এই সর্বনাশটা হয় না, টাকাগুলো বেঁচে যায়।

বস্তিভাঙ্গার ফলে ধনী থেকে গরীব হওয়ার উদাহরণ হিসাবে আয়েশার নাম আসে। আমার পরিচয় পাওয়ার পর বলেন, 'বিয়েন রে (ক্ষমতাসীন দলের নেত্রী) ভোট দিয়ে ভুল করছি, বিয়েন আমাগোরে গু-র মধ্যে ফেললো।' বস্তি ভাঙ্গার আগের এবং পরের খারাপ অবস্থা তুলনা করেন এভাবে – 'আগে স্বামীর পকেটের থেকে ত্রিশ-চল্লিশ টাকা মারা (না বলে নেওয়া) যেতো, বস্তি ভাঙ্গার পর স্বামীর পকেটে আর টাকাই থাকে না, তার আর মারবো কিভাবে?' বস্তি ভাঙ্গার আগে ৭টি রিকশা ছিল, ৫টি ঘরের ভাড়া পেতো তারা। এখন কেসের ভয়ে (বস্তিতে মারামারির) স্বামী, সন্তান পালিয়ে থাকে, রিকশা চালাবে কে? এজন্য দুইটি বাদে বাকি পাঁচটি রিকশা বিক্রি করতে হয়েছে। এখন একদমই গরিব হিসাবে নিজেকে বর্ণনা করেন। তিনি বলেন, 'তারা (কমিশনার, এম পি) থাকবে সাত তলায়' আমাগোরে (বস্তিবাসীদের) মাটির তলায়ও ঠিকমত থাকতে দিবে না।' 'ভোটের আগে এমপি জড়িয়ে ধরে এই গু-র মধ্যে (বস্তিতে) এসে বলেছে 'পাশ করলে সবার একটা করে ঘর পাকা করে দিবো আর এখন (উচ্ছেদ হওয়ার পর) এসে একটু সান্ত্বনাও দেয় না।' বস্তিতে আমার কিছু ছোট বন্ধু ছিলো এদের সাথে বিভিন্ন বিষয়ে কথা হতো। বস্তি ভাঙ্গায় তাদের সবচেয়ে বড় দুঃখ হল ঘুড়ি উড়ানোর জন্য সুতায় মাজন দেওয়ার (সুতাকে শক্ত এবং ধারালো করার একটা পদ্ধতি) টাকা চাইলে আগের মত বাবা-মা দিতে চায় না, কয়, 'দেখছ না বস্তি ভাঙ্গাছে, অভাব।'

পেশার উপর প্রভাব

বস্তিবাসীদের পেশা সম্পর্কে গবেষণাপত্রের শুরুতেই একটা ধারণা দেওয়া হয়েছে। এপর্যায়ে উচ্ছেদকৃত কল্যাণপুর বস্তির পেশাগত প্রভাব (উচ্ছেদের কারণে) বোঝার চেষ্টা করা হবে:

(ক) স্থান বস্তির মধ্যে পলিথিনের তৈরি ঝুপড়ি ঘর, বসলে মাথায় ছাদ বেঁধে যায় । উপস্থিত ৪ জন তাস খেলছে। ৬ জন দর্শক, সবাই বয়স্ক। আমি জিজ্ঞেস করলাম, 'কি করেন ভাই? একটু বসব আপনাদের সাথে?' –'দেহেন না কি করি? তাস খেলি, বসেন।' আমি বললাম আপনি 'কোন কাজকাম, ব্যবসা-বাণিজ্য কিছু করেন না? তাস খেলতেছেন দুপুর বেলা।' 'উপায় নাই ভাই, আগে মালিকের রিকশা চালাইতাম সবাই, বস্তি ভাঙ্গার পর এখন মালিক রিকশা দেয় না। বিশ্বাস করে না, বলে স্থায়ী ঠিকানা নাই আমাদের, যদি রিকশা নিয়ে পালায়ে যাই তখন কারে ধরবে?' এই একই ঘটনায় বসে আছে শুধু ঐ ১০ জন নয়, আরো অনেকে এদের সাথেও কথা হয় যারা রিকশা চালাতো, এখন মালিক ভয়ে রিকশা দিচ্ছে না হয়ত সবাই আবার নতুন কোন উৎস থেকে রিকশা পেয়ে যাবে কিন্তু বস্তি ভাঙ্গার পরপরই যখন টাকার দরকার, থাকার জায়গা নাই তখন রিকশা চালাতে না পারা খুবই সমস্যার। একই রকম সমস্যায় পড়া অনেক সিএনজি চালিত ট্যাক্সি দেখেছি যাদেরকে বস্তিভাঙ্গার কথা শুনে মালিক আর বিশ্বাস করে সিএনজি চালিত ট্যাক্সি চালাতে দিচ্ছে না, মালিকদের ভয় যদি সিএনজি নিয়ে পালিয়ে যায়।

(খ) গার্মেন্টসে চাকুরি করতো এমন অনেক মহিলার সাথে আমি কথা বলেছি। বস্তি ভাঙ্গার পর তাদের দুই ধরনের সমস্যার সম্মুখীন হতে হচ্ছে: (১) এ এলাকায় বসবাস করতো, কর্মক্ষেত্রও এই এলাকায় ছিল বর্তমানে স্থান ত্যাগ করে এতদূরে গেছে যে, চাকুরি ছাড়তে বাধ্য হয়েছে। এখন নতুন গার্মেন্টসে

চাকুরি খুঁজছে কিন্তু পাচ্ছে না। (২) স্থান ত্যাগ করে একটু দূরে গেছে এবং চাকুরি ধরে রেখেছে ঠিকই কিন্তু বিভিন্ন জটিলতায় পড়তে হচ্ছে। বেড়িবাঁধ এলাকায় কিছু মহিলার সাথে কথা হয় তারা বলেন, আগে গার্মেন্টসে যাইতাম হেঁটে (বস্তিতে থাকার সময়) এখন রোজ অনেক টাকা লাগে বাসে যাইতে, আবার সন্ধার পর গার্মেন্টস ছুটি হলে বাড়িতে ফিরে আসার সময় রাত হয়ে যায় ফলে রাস্তায় লোকজন আজেবাজে কথা বলে।' অন্যদিকে যারা নতুন গার্মেন্টস খুঁজে পাচ্ছে না তারা হতাশ, জানে না কি করবে।

(গ) বস্তির মধ্যে ভাঙ্গাড়ির ব্যবসা (পরিত্যক্ত হিসাবে পড়ে থাকা কৌটা, বোতল কুড়িয়ে বিক্রি করা) ছিলো। এই ব্যবসার খোঁজখবর নেওয়া জন্য নুরুভাই (বস্তির পাইকার) এর সাথে কথা বলি। তার সাথে যখন কথা বলতে থাকি তখন একজন ৫০০ টাকার নোট ভাংতি করতে আসে। উনি খুব দুঃখ করে বলেন, 'সেই দিন আর নাই রে, বস্তি আর কপাল একসাথে ভেঙ্গেছে।' কথা বলার জন্য তাকে বেছে নেবার কারণ হল এই ব্যবসার সাথে যুক্ত প্রায় সবাই স্থান ত্যাগ করেছে, তাছাড়া তার সাথে কথা বলার একটা সূত্র খুঁজে পেয়েছিলাম এবং উনি নামকরা পাইকার ছিলেন। এই ব্যবসার পদ্ধতি হলো –

বস্তির লোক, যারা ভাঙ্গাড়ি কুড়ায় > পাইকার > মহাজন

নূরু ভাই জানান, 'বস্তির অনেক লোক এমনকি অনেক শিশুও এই ব্যবসার সাথে যুক্ত ছিলো, সারাদিন বিভিন্ন জিনিস কুড়িয়ে এনে বিক্রি করতো এভাবে দৈনিক ২০ টাকা থেকে ১০০ টাকা পর্যন্তও এই বস্তির লোকজন আয় করতো এ ব্যবসার মাধ্যমে। এখন জিনিস কুড়াতে কোন সমস্যা নাই, কিন্তু পাইকারদের যে দোকানগুলো ছিলো সেগুলো আর একটাও অবশিষ্ট নাই। এই পেশার সাথে যুক্ত ছিল বস্তির এমন লোকের সাথে কথা বলেছি। তারা বলেছেন, আগে পাইকারের (স্থানীয়) সাথে একটা লেনদেন ছিল কোনদিন কাজ ঠিকমত না হলেও ৫০ টাকা নেওয়া যেতো কিন্তু বর্তমানে সমস্যা, এখানে থাকতে পারবো কিনা তারই ঠিক নাই ব্যবসা করে কি করব? 'বস্তি এলাকায় খড়ির বিভিন্ন কাঁচামাল, ছাপড়া হোটেলের ব্যাপক ব্যবসা ছিল এবং এর সাথে অনেকের রুটি-রুজি যুক্ত ছিল কিন্তু বর্তমানে কিছুই অবশিষ্ট নাই। এছাড়া বস্তির মহিলাদের আরেকটি বড় ব্যবসা ছিলো মাটির চুলা তৈরি করে বিক্রি করা ও কাগজের ঠোঙা বিক্রি করা (বাড়িতে বসে তৈরি করে বিক্রি করা)। বেশ কয়েকজন মহিলার সাথে আমার কথা হয় যাদের সংসার চলতো এর মাধ্যমে (একটি মাটির চুলা ১৫ থেকে ২০ টাকায় বিক্রি হতো)। ঐ ব্যবসাগুলো বস্তির উপরই নির্ভর করতো কারণ মাটির চুলা কিংবা হোটেল এসবের কাস্টমার ছিলো বস্তির লোকজন।

(ঘ) ছাট ফল (যেমন–ভাল আঙ্গুর ফল বেছে নেওয়ার পর পচাগুলো), ডিম সিদ্ধ, চটপটি, আচার, আইসক্রিম, পোস্টার, ফুল এসব বিক্রি করতো অনেকে যেগুলো বস্তি ভাঙ্গার সাথে সাথে বন্ধ হয়েছে কারণ এর প্রধান ক্রেতাই ছিল বস্তির লোক। আবার বস্তি ত্যাগ করেছে যেসব ব্যবসায়ীরা তারা বেশিরভাগ ক্ষেত্রেই বেশ দূরে চলে গেছে (যেমন সাভার, বেড়িবাঁধ)। এত দূর থেকে ঢাকার মধ্যে এসে ব্যবসা করতে গেলে খরচ অনেক বেড়ে যাবে।

যৌন ব্যবসার উপর প্রভাব

খাদিজা এবং হাসি যে যৌন ব্যবসার সাথে যুক্ত ছিলো একথা বস্তির প্রায় সবাই জানত। বৃদ্ধ মা'সহ পাঁচ জনের সংসার খাদিজকে চালাতে হতো এ পেশার মাধ্যমে। বর্তমানে বস্তি উচ্ছেদ হওয়ার কারণে উপার্জন বন্ধ থাকায় খুবই কষ্টের মধ্যে তার দিন যাচ্ছে, 'ঘর ভাড়া দিতে পারিনি, বাজার করতে পারেনি, ঘরে চাল নেই বলে মা বকাবকি করেছে, মার দিয়েছে।' অন্যদিকে হাসি প্রথম দিকে সবকিছু অস্বীকার করলেও একটা পর্যায়ে সবকিছু স্বীকার করেন। কিভাবে তিনি একদিন গার্মেন্টসে কাজ করে ফিরে আসার সময় কিডন্যাপ হন? কিভাবে তিনি পালিয়ে আসেন? পরে কিভাবে উনার বিয়ে হয়? কিভাবে স্বামী অন্য মেয়ে নিয়ে তারই সামনে স্ফূর্তি করতো বলে সেই বিয়ে ভেঙ্গে যায়- এসব সহ বিভিন্ন বিষয়ে তিনি অনেক কথা বলেন।

'খাদিজা' ৮ম শ্রেণী পর্যন্ত লেখাপড়া করা। তিনি যখন আমার সাথে কথা বলার জন্য এসএস নামক এনজিও'র অফিসে আসেন তখন তার সারা গায়ে ধুলা, হাতে, পায়ে মারের দাগ, কারণ তার মা তাকে মেরেছে। নিজের ২ বোন, ১ ভাই এবং মাকে নিয়ে সংসার তাকেই চালাতে হয় ঐ যৌনব্যবসার টাকায়। বস্তিভাঙ্গায় রোজগার প্রায় বন্ধ তাই ঘরভাড়া (না ভাঙ্গা অংশে থাকে) দিতে পারেনি, বাজার করতে পারেনি, চাল কিনতে পারেনি বলে মায়ের হাতে মার খেতে হয়েছে।

বস্তিভাঙ্গার আগে আয়ের টাকা অনেক জায়গায় ভাগ দিতে হলেও তখন (উচ্ছেদের আগে) জীবনের একটা নিশ্চয়তা ছিলো, সংসার চলতো ঠিকমতো। বস্তি ভাঙ্গার পর মাত্র তিনজন বস্তিতে আছে বাকি সবাই জায়গা (বস্তি) ত্যাগ করে অন্য জায়গায় চলে গেছে। এদের খবর ঠিকমতো জানা যায়নি। পুলিশের ভয়ে কাস্টমাররা এখন বস্তিতে আসে না, আসলেও ঠিকমতো (তাদেরকে) খুঁজে পায় না। স্থান ত্যাগ করা এক মহিলার (যৌনকর্মী) কথা 'হাসি' জানায় যে, 'সে মহল্লায় ঘরভাড়া করেছিলো কিন্তু কাস্টমারসহ ধরা পড়ায় মহল্লাবাসী মেরে তাড়িয়ে দিয়েছে।' আগে ব্যবসায় অনেকগুলো বিকল্প জায়গা ছিল কিন্তু বর্তমানে শুধু হোটেল নির্ভর হয়ে যেতে হয়েছে। তিনি আরো জানান বস্তিতে (উচ্ছেদের পর) তার দুইজন কাস্টমার এসেছিল কিন্তু 'ফরমা' (পুলিশের ইনফরমার) সন্দেহে লোকজন বস্তি থেকে বের করে দিয়েছে। বস্তি উচ্ছেদের দিনে তিন সেট কাপড় এবং দুই জোড়া নতুন সেণ্ডেল হারিয়ে এখন দিশাহারা অবস্থা। কারণ হোটেলে যেতে হলে নতুন কাপড় পরে 'হেনছাম'(সুবেশ) হয়ে যেতে হয়, না হলে ঠিকমত কাস্টমার হয় না। ঠিকমতো কাস্টমার না হওয়ায় বর্তমানে এক প্রকার উপোস থাকতে হয়, ঘরভাড়া পর্যন্ত বাকি পড়ে আছে। অন্যদিকে বস্তির পাশের খালা (রুকসি) বর্তমানে তার বাড়িতে ব্যবসা বন্ধ করে দিয়েছে কারণ ঐ ব্যবসার চেয়ে ঘরভাড়া দেওয়া নিরাপদ এবং বেশি টাকা পাওয়া যায় (বস্তি উচ্ছেদের পর এই এলাকায় ঐ ধরনের কম টাকার ঘরের ভাড়া বেশি হয়ে গেছে)। এই অসহায় অবস্থার (বস্তি উচ্ছেদ পরবর্তী) সুযোগ যে মানুষে নিতে চাচ্ছে তার প্রমাণ হিসাবে খাদিজা ও হাসি দু'টি ঘটনার কথা বর্ণনা করেন, (১) 'খাদিজা'কে একজন লোক প্রস্তাব দিয়েছে- তুমি আমার সাথে থাকবা, সবাই জানবে তুমি আমার নাতনি-বাড়ির সব কাজ করবা, রান্নাবান্না করবা - রোজ তোমাকে ৫০ টাকা করে দিবো। (২) 'হাসি'র বাবা-মায়ের কাছে এক বৃদ্ধলোক প্রস্তাব দিয়েছে ৫০ হাজার টাকার বিনিময়ে সারা জীবনের জন্য কিনে নিয়ে যাবে, তবে মাঝে মধ্যে বাবা-মা এসে দেখে যেতে পারবে। বউ হিসাবে স্বীকৃতি দিবে না তবে অনেক দিন রাখবে।

এনজিওদের কার্যক্রমে প্রভাব

বস্তিতে ক্ষুদ্রঋণ পরিচালনাকারী এনজিওগুলো এক ধরনের জটিল অবস্থার সম্মুখীন। কারণ তাদের কিস্তি আসা বন্ধ হয়ে আছে। অনেকে (বস্তিবাসী) বলেন, এনজিওওয়ালাগো তো আর চিন্তা নাই। 'প্রশ্ন করি, 'কেন'? উত্তর দেয়, 'কেন, জানেন না? পরশিকা (প্রশিকা) সেফটি (সেফ সেভ) এসব এনজিও'র টাকা তো সরকার শোধ করে দিয়েছে সেজন্য কোটি কোটি টাকা বস্তিতে পড়ে আছে, তাও দেখেন না, তারা কিছু বলে না, না হলে ঠিকই এনজিও'রা বস্তি ভাঙ্গতে দিতো না। 'আবার বস্তির হিরো এমএ জামান বস্তিতে এসে মিছিল করে একটা জ্বালাময়ী ভাষণ দিয়ে গেছেন, 'আপনারা (বস্তিবাসী) সকল এনজিও'র কিস্তি দেওয়া আগামী দুই মাসের জন্য বন্ধ করে দেন। এনজিও'র ভাইদের বলছি আপনারা কেউ কিস্তি নেওয়ার জন্য বস্তিতে আসবেন না, পারলে নগদ টাকা, গরমকাপড়, নলকূপ বস্তি বাসীদেরকে দিয়ে যান।' কিস্তি না দেওয়ার জন্য বস্তিবাসীরা এগুলোকে অজুহাত হিসাবে ব্যবহার করেন।

এসব কিছুর বাইরেও বিভিন্ন কারণ দেখিয়ে বস্তির লোকজন কিস্তি দিতে অনীহা প্রকাশ করে থাকেন, যেমন, 'কিস্তি দিতে পারব না, আমার হার্টের অসুখ, ডাক্তার বলেছে সারা শরীর এক্সরে করতে হবে।' 'কয়েকদিন পর ছেলের মুসলমানী, অনেক টাকার প্রয়োজন এখন কিস্তি দিতে পারবো না' – 'তোর ছেলের মুসলমানী সেই কবে হয়ে গেছে না? আবার দিবি?' পাশের আরেক মহিলা ভুল ধরে। 'বিষ খাওয়ার টাকা নেই কিস্তি দিবো কিভাবে? পারলে টাকা অথবা বিষ দিয়ে যান, খেয়ে মরে বাঁচি', 'বস্তি ভাঙ্গার সময় পাশ বই নষ্ট হয়ে গেছে, আন্দাজে কিভাবে দিব? পরে অফিসে গিয়ে হিসাব-নিকাশ করে টাকা দিয়ে দিবো' 'ঐ আপারে (কিস্তি আদায়কারি) টাকা দিয়ে দিছি, তারে ডেকে আনেন।' তাকে (আপা) নিয়ে আসার পর বলে 'এই আপারে না ঐ মোটা আপারে (অন্যজন) দিছি' এভাবে বিভ্রান্ত করা হয়। 'আপা আপনাগো লজ্জা করে না? এই অবস্থার মধ্যেও টাকা নিতে আসেন? আগে একটু শক্ত হয়ে নিই তারপরে দিয়ে দিব।' - এ ধরনের অনেক কারণ ও অজুহাত দেখায় বস্তিবাসীরা।

ক্ষুদ্রঋণ প্রকল্পের সাথে যুক্ত এনজিও হিসাবে এসএস-এর অবস্থা দেখলেই উচ্ছেদ পরবর্তী তাদের চিন্তা ভাবনাগুলো স্পষ্ট হবে –

- বস্তিভাঙ্গার পরদিন থেকেই লোন প্রদান বন্ধ করে দেওয়া হয়েছে।
- এক মাসের মধ্যে লোকবল (ক্যালেক্টর) কমিয়ে ৭ জন এর স্থানে ৩ জন করে ফেলা হয়েছে।
- বাড়িওয়ালাকে (অফিসের) বলে দেয়া হয়েছে সামনের মাসে (উচ্ছেদের পর দুইমাস) আমরা অফিস ছেড়ে দেবো।
- কল্যাণপুর শাখার উক্ত দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা জানান। বস্তি এখানে আর হবার সম্ভবনা নাই। আর বস্তি আবার হলেও ঝুঁকি থাকবে সেজন্য এখানে আর কার্যক্রম চালানো হবে না। যে টাকা উঠে আসে সেটাই লাভ।

এ পর্যায়ে আমরা স্বাস্থ্য ও শিক্ষা কার্যক্রমের সাথে যুক্ত এনজিওগুলোর পরিবর্তিত পরিস্থিতির চিন্তাভাবনা সম্পর্কে তথ্য দেয়ার চেষ্টা করবো।

ফুলকি এনজিওটির উচ্ছেদ পরবর্তী কার্যক্রম বস্তিবাসীদের হাসির খোরাক হয়ে দাঁড়িয়েছে। কারণ এদের অফিসের জায়গাটি বাঁশ পলিথিন দিয়ে ঘিরে একজন মহিলাকে ভাড়া রেখেছে পাহারা দেয়ার জন্য (জায়গা দখলে রাখার জন্য)। ফুলকির পিসি-র সাথে আমার কথা হয়, তিনি বলেন, ঐ স্থানে বস্তিও আর হবে না, প্রোগ্রামও আর চালান হবে না। তবে তিনি বস্তির পার্শ্ববর্তী মহল্লায় একটি ডে-কেয়ার সেন্টার খোলার সম্ভাবনার কথা জানান। কারণ বস্তিতে টিকে থাকা অনেক গার্মেন্টস কর্মী ফুলকিকে বারবার অনুরোধ করছে ডে-কেয়ার সেন্টার করার জন্য যাতে তারা বাচ্চা রেখে গিয়ে চাকুরি করতে পারে।

মেরী স্টোপস ক্লিনিকের মাঠকর্মীরা তাদের অভিজ্ঞতা থেকে কিছু গল্প আমাকে শোনান, 'বস্তি ভাঙ্গার পর, হেড অফিস থেকে অপেক্ষা করতে বলে, এখন ক্লিনিক করা সম্ভব নয় বলে জানায়। কিন্তু বস্তিবাসীরা তো আর হেড অফিস চেনে না, তারা আমাদেরকে (স্থানীয় মাঠকর্মী) বারবার বিরক্ত করে, ক্লিনিক করার জন্য। যেদিন বস্তি ভাঙ্গে তারপর দিনই ৩ মহিলার (উনাদের সদস্য) প্রায় গাছ তলায়, খোলামাঠে বাচ্চা হয়, আমরা কিছুই করতে পারি না। আবার স্বল্পমেয়াদী যে পরিবার পরিকল্পনা পদ্ধতি আমরা অনেককে দিয়েছিলাম তাদের অনেকের নতুন করে পদ্ধতি নেওয়ার সময় চলে গেছে, ক্লিনিক বন্ধ থাকায় দিতে পারিনি। চার জনের খবর জানি যাদের বাচ্চা নেয়ার ইচ্ছা ছিল না। কিন্তু আমরা ইনজেকশন না দিতে পারায় তারা গর্ভবতী হয়ে গেছে। সবাই বাড়ি এসে (মাঠকর্মীদের) ওষুধ, বড়ি, কনডম চায়, কারো প্রসববেদনা উঠলে বাড়িতে চলে আসে কিন্তু ক্লিনিক তো বন্ধ, কি করব?' এই ক্লিনিকের মাঠকর্মীরা আরও জানান, 'মাঝে মাঝে মানুষের দুঃখ দেখলে কষ্ট হয়। কাছে অ্যান্টিবায়োটিক থাকলেও দিয়ে দিতাম, খেয়ে যা হয় হতো।' একজন মাঠকর্মী বলেন, 'লজ্জার কথা কি বলব ভাই, মহিলাদের কান্নাকাটি দেখে আমার স্বামীর নিয়ে আসা (আমার জন্য) পিল থেকে তাদেরকে অনেক সময় দিয়ে দিই।' অনেক পুরানো রোগী বলে, 'আপনাদের (মেরী স্টোপস) ওষুধ না খেলে ভাল হবো না।'

মাঠকর্মীরা বলেন, 'মানুষের কষ্ট সহ্য করতে না পেরে হেড অফিসে বলি, স্যার ক্লিনিক খুলেন, সবাই বিরক্ত করে।' হেড অফিস থেকে বলে, 'ক্লিনিক করা যাবে, কিন্তু ডোনাররা ক্লিনিক বস্তিতে দেখতে চায়।' পরবর্তীতে মাঠকর্মীদের নিজেদের প্রচেষ্টায় বস্তিতে (না ভাঙ্গা অংশে) আবার ৩,০০০ টাকায় ঘর ভাড়া নিয়ে ক্লিনিকের কার্যক্রম শুরু হয়েছে। মাঠকর্মীরা জানান সবাইকে (বস্তিবাসী) নতুন ক্লিনিক চেনাতে তাদের অনেক সময় চলে যায়। এজন্য কাজের সমস্যা হয়।

এএসডি স্কুলের ক্ষেত্রে দেখা যায়, চল্লিশ জনের মধ্যে বর্তমানে ৫ বা ৬ জন করে ছাত্রছাত্রী উপস্থিত হয়, কারণ বেশিরভাগ ছাত্রছাত্রীর অভিভাবক এখান থেকে চলে গেছে, তাই উপস্থিতির এ হাল। অন্যদিকে শিশু শ্রমিক ছাড়া, ছাত্রছাত্রী হিসাবে নেওয়া যাবে না বলে শিক্ষকরা নিজেদের চাকুরি নিয়ে চিন্তিত, কারণ হেড অফিস থেকে বলা হয়েছে ছাত্রছাত্রীদের উপস্থিতির হার না বাড়লে স্কুল বন্ধ করে দেয়া হবে।

রাড্ডা ক্লিনিকের লোকজন বস্তিভাঙ্গার বেশ কয়েক দিন পর বস্তিতে আসে (আমি সেদিন উপস্থিত ছিলাম)। বস্তিবাসীরা এসে যখন বারবার প্রশ্ন করে এতদিন আসেননি কেন? তখন ক্লিনিকের লোকজন বিব্রত বোধ করে এবং বস্তিবাসীদেরকে তাদের অক্ষমতার কথা বোঝাতে থাকে। 'আমাদের কিছুই করার নেই, আমরা আসলেই বা আপনাদের কি লাভ হতো?' – এরপর বস্তিবাসীদের কাছে মাফ চেয়ে

নিয়ে অস্থায়ীভাবে হলেও একটা জায়গা দিতে বলেন যেখানে বসে বস্তিবাসীদের (অবশিষ্ট) স্বাস্থ্যসেবা দিবে। একটা পর্যায়ে উপস্থিত বস্তিবাসীরা সিদ্ধান্ত দেন, 'তা হলে মসজিদের বারান্দায় বসেন।' উপস্থিত কর্মকর্তাকে প্রশ্ন করেছিলাম বর্তমান পরিস্থিতিতে আপনাদের চিন্তাভাবনা কি? 'হেড অফিস থেকে কোন সিদ্ধান্ত দিতে পারছে না, আমাদের অপেক্ষা করতে বলেছে এবং বস্তির পরিস্থিতির উপর নজর রাখতে বলেছে, পরিস্থিতি ভাল হলে তখন নতুন করে চিন্তাভাবনা করবে। এর আগপর্যন্ত ভ্রাম্যমান হিসাবে গাড়িতে ওষুধপত্র এনে বস্তিবাসীদের সেবা দেওয়া সম্ভব কিনা চিন্তাভাবনা চলছে।'

হতভাগ্য কয়েকজন

আবুল খায়েরের গল্প

আবুল খায়ের আকন্দ নোয়াখালী থেকে এসে ১৭ বছর আগে বস্তিতে ঘর তুলেছিল। বস্তি ভাঙ্গার দিন মালপত্র রেখে নতুন জায়গা খোঁজার জন্য বের হন এবং পরিচিত একজনের কাছ থেকে খবর পান বালুরটেকে কমদামে, জায়গা পাওয়া যায় (উনার ঘর দরকার নাই, কারণ ঘর তৈরির টিনবাঁশ ছিলো যেটা দিয়ে শুধু জায়গা ভাড়া নিয়ে ঘর করলেই চলে)। সেখানে গিয়ে পচা ডোবার পাশে অনেক কষ্টে ২০ টাকা হাত হিসাবে ৩২ হাত জায়গা তিনি ভাড়া নেন। কারণ বউ, ৩ ছেলে, ছেলের বউ, নাতি নিয়ে অনেক বড় সংসার। কিন্তু ৫/৬ দিন থাকার পরই বুঝতে পারেন এখানে আর থাকা যাবে না, পচা ডোবার গন্ধ, মশার ব্যাপক উৎপাত এবং ঘরবাড়িতে যাওয়ার রাস্তার বেহাল অবস্থা। এখানে আরো জটিলতা ছিলো কারণ মূল পেশা 'টোং দোকান' দেয়ার কোন জায়গা এখানে যেমন ছিল না, আবার যে ছেলেকে দিয়ে পোস্টারের ব্যবসা করাতেন সেও দূরত্বের কারণে ঢাকায় গিয়ে ঠিকমত ব্যবসা করতে পারে না। এমন সময় বেয়াইয়ের (ছেলের শ্বশুর) কাছ থেকে খবর পান আদাবরে ৪০ টাকা হাত জায়গা পাওয়া যাবে। চলে আসেন নতুন জায়গায়। জায়গাটা বেশ ভালই ছিল, কারণ দোকান দেওয়ার জায়গা ছিলো এখানে। দ্রুত তিনি ঘরবাড়ি তৈরি করে ফেলেন এখানে। হঠাৎ নতুন সমস্যা হিসাবে দেখা দেয় এলাকার গুটি কয়েক রংবাজ। নতুন ঘর, দোকানের জন্য চাঁদা দাবি করে ১৩,০০০ টাকা। '১৩ টাকাই নেই আবার ১৩,০০০ তবুও সাহস করে দোকান খুলি' – ঐ দিনই মাস্তানরা দোকান ভাঙচুর করে। জমির মালিককে সমস্যা জানালে, 'আমি কি করবো'- এমন ভাব দেখায়। তিনি শুরু করেন নতুন জায়গা খোঁজা, বড় ছেলে খবর নিয়ে আসে, গোদেরটেকে ভাল জায়গা আছে। ৪০ টাকা হাত হিসাবে ২৩ হাত এবং দোকান বসানো বাবদ মাসে ৭০০ টাকা ভাড়া হিসাবে এখানে আগের জায়গা থেকে যাবতীয় সবকিছু (টিন, বেড়া, বাঁশ) খুলে নিয়ে আসেন। এখানে এসেও তিনি শান্তিতে নাই, কারণ এ জায়গাটি বড় গর্ত ভরাট করে তৈরি করা, পাশে এখনও গর্ত রয়েছে, বর্ষাকালে বসবাস করা কষ্টের হবে। তাছাড়া নতুন এলাকা, দোকানের বিক্রিও তেমন একটা নাই।

কসাইয়ের স্বাধীনতা

যশোরের কামাল কসাইয়ের কাজ করতো। বস্তি ভাঙ্গার দিন তার এক সহকর্মী বললো, 'বস্তিতেও ভাড়া দিয়ে থাকো (৬০০ টাকা) এখানেও ভাড়া দিয়ে থাকবা, আমার পাশে একটা রুম খালি আছে (গোদেরটেক) এখানে চলে আস।' ফলে ঐদিন সন্ধ্যায়ই ৮০০ টাকা ভাড়া হিসাবে এখানে চলে আসে। 'স্বাধীনতা নাই' বলে তিনি বলেন, 'বাড়িতে আত্মীয় আসলে পানি বন্ধ করে দেয়, বাচ্চা জোরে কান্নাকাটি করলে বাড়ি ছেড়ে দিতে বলে। জোরে ক্যাসেট বাজানো যায় না। মালিক বকাবকি করে।'

খুব কষ্টে আছেন বলে তিনি আরো জানান বস্তি যদি আবার হয় এবং ভাড়া যদি ১,০০০ টাকাও হয় তবুও তিনি আবার বস্তিতেই যাবেন।

অসহায় মোমেনা

একটি অফিসের পিওন হিসাবে কাজ করতো (মীরপুর) স্বামীহারা মোমেনা। বস্তি ভাঙ্গার পর প্রতিবেশীদের সাথে সেও চলে আসে সাভার। তখন বুঝতে পারেননি যে, সাভারে ঘর ভাড়া কম ঠিকই, কিন্তু চাকরি টিকিয়ে রাখা কষ্ট হবে এত দূর থেকে গিয়ে অফিস করলে। বস্তিতে থাকার সময় কেউ কোন সমস্যা করতো না, মেয়ে দুইটিকে নিয়ে নিরাপদে ছিলেন। বর্তমান অবস্থার কথা বর্ণনা করতে গিয়ে তিনি বলেন, 'এখন অফিস থেকে ফেরার পথে রোজ তিন বেটা পেছনে লাগে। সেদিন রাতে ঘরের দরজায়ও টোকা দিছে, আমি চিৎকার দেওয়ায় সবাই পালিয়ে গেছে।' বস্তি যদি আবার হয় তিনি বস্তিতে ফিরতে চান।

আত্মীয়ের বাড়ি

বস্তির শাহীন মিয়া বস্তি ভাঙ্গার পর অন্য সবার মত ততটা চিন্তায় পড়েনি। কারণ গাবতলীতে তার ছোট বোন থাকে স্বামী সন্তানসহ। ৬০০ টাকা ভাড়ায় বস্তির ঘর ভাঙ্গার পরদিনই বউ, বাচ্চাসহ বোনের বাড়িতে যাবার ইচ্ছা ছিল। সেখানে দুই একদিন থেকে পরে নতুন ঘর দেখে ভাড়া নিয়ে উঠে পড়বে। কিন্তু ৭-৮ দিন থাকার পরই বোনের স্বামী রাগারাগি করেন 'কবে বাড়ি ছাড়বে?' আবার বাড়ি ছেড়ে চলে যেতে বলে, 'নিজেরই থাকার জায়গা নাই আবার...', ঐ দিন রাতেই শাহীন মিয়া নতুন জায়গা খুঁজতে বের হয় এবং কোথাও সুবিধাজনক কিছু না পেয়ে বস্তিতে চলে এসে খোলা জায়গায় পলেথিন ও বাঁশ দিয়ে ঘর করে (জমির মালিকের কাছে কয়েকদিন থাকতে চাওয়ার অনুমতি নিয়ে) থাকে, কিন্তু শীতের মধ্যে ছোট বাচ্চাটির অসুখ এবং ঘুমানোর কষ্টের কারণে জরুরি ভিত্তিতে বাড়ি খুঁজে আগারগাঁও এলাকার এই জায়গা বের করে। ৯০০ টাকায় একটা ঘর ভাড়া করেন। বর্তমানে তিনি আগারগাঁও আছেন তবে খুবই চিন্তিত। কারণ, সামান্য কাঁচামালের ব্যবসা করে কিভাবে ৯০০ টাকা ঘর ভাড়া দিয়ে বউ বাচ্চা নিয়ে খেয়ে পরে বেঁচে থাকবেন!

হারানো মুরগি

মাত্র ৬ মাস আগে আবুল (বস্তিভাঙ্গার) সাইকেল, ভ্যান, রিকসা মেকারের (মিস্ত্রী) বুদ্ধি ও দক্ষতা সম্বল করে কুমিল্লা থেকে ঢাকা চলে আসে, কারণ গ্রামে মামলায় (মারামারি সংক্রান্ত) পড়ে শেষ সম্বল জমি বিক্রি করেও শেষ রক্ষা হয়নি। ৬০০ টাকার ভাড়াওয়ালা রুমে বস্তিতে বেশ ভালই ছিল। কারণ স্ত্রী এবং ছোট দুইটি বাচ্চা নিয়ে তার ছোট সংসার ছিল। বস্তি যেদিন উচ্ছেদ হয় সেদিনকে, 'হারিয়ে যাওয়া মুরগির সাথে নিজেকে তুলনা করেন। কারণ মুরগি হারিয়ে অন্য পাড়ায় চলে গেলে, সন্ধ্যার পর যদি মানুষজন দেখে তাহলে ধরে খেয়ে ফেলে। ঐ মুরগির মতই তিনি নাকি ঐ দিন অসহায় ছিলেন। এবং খোলা জায়গায় মালপত্র (বস্তির পাশে) এবং বউ-বাচ্চা রেখে অপরিচিত মানুষজনের কাছে জানতে চান – 'কোথায় কম দামে ঘর ভাড়া পাওয়া যায়।' 'ঘুরতে, ঘুরতে তিনি গাবতলীর পেছনের দিকের একটা জায়গায় চলে যান। তখন বেশ রাত, খোলা আকাশের নিচে রেখে যাওয়া মালপত্র এবং পরিবারের চিন্তায় তিনি তখন অস্থির। এসময় সেখানকার এক উকিলের সাথে তার দেখা হয় (ঐ

উকিলের বাড়ি ওখানেই)। সবকথা শুনে মালপত্র পরিবার নিয়ে উকিল তার বাসায় চলে আসতে বলেন আবুল তখনই বস্তিতে ফিরে ভ্যান ভাড়া করে সবকিছু নিয়ে রাত ১০ টায় ঐ উকিলের বাড়িতে চলে আসে। পরে ঐ উকিলেরই বাড়ি (প্রায় বস্তি ধরনের) খালি হলে (ভাড়াটিয়া চলে যায়) ৮০০ টাকা ভাড়ায় ১০ দিন পর উঠে পড়ে। এই ১০ দিন উকিলের বাড়ির বারান্দায় পরিবার নিয়ে থাকতে দেয়াকে আবুল 'বাপের কাম করেছে বলে রায় দেয়'।

আলিম ভাইয়ের মালিক

সিএনজি চালক আলিম মোল্লা বস্তিতে থাকতো ৯ বছর ধরে। সিএনজি'র মালিক তাকে খুব পছন্দ করতো ঠিকমত লেনদেন করতো বলে। এমনকি আলিম পরিবার নিয়ে মালিকের বাড়িতে দাওয়াত খেয়েছে বলে জানান। বস্তি ভাঙ্গার পরপরই আলিম তাঁর মালিকের সাথে দেখা করে। মালিক বেনারসি পল্লীতে থাকা তাঁর এক কর্মচারীকে দায়িত্ব দেয় আলিমের থাকার ব্যবস্থা করার জন্য। পরে ঐ কর্মচারী নিজের বাড়িতে নিয়ে গিয়ে তাদেরকে মালপত্রসহ ঐ রাতের জন্য রাখে। পরের দিন ঐ এলাকায় ১,১০০ টাকা ভাড়ার একটা ঘরে তাকে উঠিয়ে দেয়। এই নতুন জায়গায় ভালই আছেন বলে আলিম জানান। ভাড়া কয়েক'শ টাকা বেশি লাগলেও এখানকার পরিবেশ ভাল। তাছাড়া মালিকের বাড়ি পাশে থাকায় সুবিধা-অসুবিধায় মালিক খোঁজখবর রাখে।

এভাবে বিভিন্ন মাধ্যম ব্যবহার করে বস্তির লোকগুলো স্থান (বস্তি) ত্যাগ করে নতুন জায়গায়, নতুনভাবে জীবনযাপন শুরু করেছে। আর এ স্থান ত্যাগকারী বস্তিবাসীদের অবস্থা দেখার জন্য যখন বিভিন্ন জায়গায় গিয়েছি তখন লক্ষ্য করেছি বস্তি উচ্ছেদ মানে 'নতুন বস্তির সৃষ্টি'। ঢাকা শহরের ভেতর থেকে একটা বস্তি উচ্ছেদ করা মানে ঐ বস্তির লোকগুলো মূল শহর থেকে একটু দূরে গিয়ে নতুন আরেকটা বস্তির সৃষ্টি করে। উদাহরণ হিসাবে এক ঘটনা উপস্থাপন করছি।

গোদেরটেক হলো গাবতলীর পেছনের একটা জায়গা যেখান থেকে ঢাকা শহরের বড় বড় দালানগুলো পরিষ্কার দেখা যায়। কিন্তু সেখানে যেতে হলে বড় একটা বাঁশের সাঁকো এবং পচা পানির একটি নালা নৌকায় পার হতে হয়। লক্ষ্য করলাম এখানকার বেশির ভাগ পরিবারই মূল ঢাকা শহর থেকে ঝরে পড়া। হয় উচ্ছেদ হয়ে অথবা জীবনযাত্রার মানের সাথে খাপখাওয়াতে না পেরে এখানে এসেছে। এখানকার জীবনযাত্রার মান বোঝাতে একটা কথাই যথেষ্ট – 'শালারা মদ খাচ্ছে' (আমি এবং ম্যানেজার এসএস কোক পান করার সময় ঐ এলাকার মধ্যে ঘুড়ি উড়াতে থাকা কয়েকটি ছেলে এ কথা বলে)।

বস্তিত্যাগ – টিকে থাকার চেষ্টায়

এই বিষয় সম্পর্কে তথ্য সংগ্রহের জন্য প্রধান তথ্যদাতাদের (স্থানীয় একটি এনজিও ম্যানেজার ও কালেক্টর) ক্লায়েন্টদের (যারা স্থান ত্যাগ করেছে) ঠিকানা ধরে ধরে বিভিন্ন জায়গায় যেমন – গোদেরটেক, বেড়িবাঁধ, গাবতলী, সাভার, মিরপুর যেতে হয়েছে। বস্তিত্যাগ করার পর নতুন পরিস্থিতিতে খাপ-খাওয়ানো বা টিকে থাকা – বিষয়টি বোঝার জন্য ৮৯টি পরিবারের সাথে কথা বলেছি। এদের নতুন জায়গাতে আসার পদ্ধতি বা মাধ্যমগুলোর বিশ্লেষণ থেকে নিম্নোক্ত চিত্র পাওয়া যায়:

সারণী ১১. বস্তি ত্যাগের মাধ্যম

যার মাধ্যমে স্থান ত্যাগ করেছে	সংখ্যা (৮৯ জনের মধ্যে)
সামান্য পরিচিত (বন্ধু ধরনের)	১৯ জন
সহকর্মী (রিকশা, বাস শ্রমিক)	১৭ জন
নিকট আত্মীয় (ভাইবোন ধরনের)	১৮ জন
বস্তিতেই জিনিস রেখে কম দামের বাসা খোঁজে	১৫ জন
মালিকের (দোকান মালিক ধরনের) মধ্যস্থতায়	৭ জন

নতুন জায়গায় (বস্তি উচ্ছেদের ফলে) এসে লোকজন যে ধরনের সমস্যা বা অসুবিধাকে প্রধান হিসাবে ভাবে সেগুলোকে এভাবে দেখানো যায়:

বাপের বাড়ির মায়া

বস্তিতে (উচ্ছেদের পর) ঘুরতে থাকলে দেখা যাবে কিছু লোক শুকনা মুখে ঘুরে বেড়ায়, চা খায়, গল্প করে। এদের বেশিরভাগের সাথে কথা বললেই তাঁরা জানায় 'মায়া' লাগে তাই দেখতে আসি। দীর্ঘদিন এই বস্তিতে থেকেছে এখন নতুন জায়গায় গিয়ে ঐ মায়া ত্যাগ করতে না পেরে অনেককে চোখের পানিও ফেলতে দেখেছি। কারিনার সাথে কথা হয়, সে জানায়, '১৬ বছর বস্তিতে ছিলাম এখন কল্যাণপুর থাকি। মন পুড়ে, ছেলেরে কইলাম আমারে বস্তি দেখিয়ে নিয়ে আয়। ছেলে গাড়িতে করে এখানে এনেছে কিন্তু গাড়ি থেকে নামার পর আর পা চলতে চায় না, কান্না আসে বস্তির (উপর) পরে বাপের বাড়ির মত মায়া জন্মে গেছে।'

ফ্রি

'বস্তিতে অনেক ভাল ছিলাম ভাই। ঘরভাড়া লাগত না, পোলাপানের পড়াশোনার টাকা লাগতো না (বিভিন্ন এনজিও'র স্কুল ছিল), শালার কনডমও ফ্রি পাইতাম। হাতের কাছে ডাক্তার ছিল (এনজিওগুলোর ক্লিনিক), মহাজন (ক্ষুদ্রঋণ পরিচালনাকারী এনজিও) ছিল বিপদে টাকা দেওয়ার জন্য, আর এখন কেউ নাই, নতুন বিপদ।' এভাবে অনেকে বস্তির নামমাত্র বা ফ্রি পাওয়া সেবাগুলো বর্তমানে পাওয়া যায় না বলে দুঃখ প্রকাশ করে।

কর্মস্থল দূরে

মোমেনা, যে বর্তমানে বেড়িবাঁধে থাকে, বস্তিতে থাকার সময় ১,০০০ টাকা মাসিক বেতনে সিএনজি ট্যাক্সি কোম্পানীতে চাকুরি করতো, অফিসের গাড়িতে যাতায়াত করতো। বর্তমানে অফিস করতে রোজ ২৫ টাকা খরচ হয়। এমন অনেক গার্মেন্টস কর্মীর সাথে কথা হয়েছে যাদের বেতন এবং যাতায়াত ভাড়ার (বর্তমান বাসস্থান থেকে) ব্যবধান খুবই কম বা প্রায় নাই।

ছেলে রেখে যেতাম

'ছেলে রেখে (ছোট বাচ্চা) কাজে (হোটেলের থালাবাটি ধোয়া) যাইতাম, প্রতিবেশীরাও ভাত দিতো।' দীর্ঘদিন এক সাথে থাকার ফলে যে পারস্পরিক লেনদেন/সহযোগিতা গড়ে উঠেছিল, সেটিকে দারুণভাবে অনুভব করে স্থান ত্যাগ করা অনেক বস্তিবাসী।

ঢেলামারে, শিস দেয়

যেসব পরিবারগুলোতে বিয়ে না হওয়া তরুণী মেয়ে আছে তাদের একমাত্র এবং প্রধান চিন্তা হিসাবে এ বিষয়টিকে বর্ণনা করেন। নতুন জায়গায় আসার পর এলাকার উঠতি বয়সের ছেলেরা বিরক্ত করে। আমিনুল বলেন, 'আমার বড় দুই মেয়ে গার্মেন্টেসের ডিউটি করে বাড়ি আসার সময় প্রত্যেক দিন রাস্তায় পোলারা শিষ দেয়, ঢেলা মারে 'আমাকে কাজ বাদ দিয়ে গার্ড দেওয়ার জন্য (মেয়েদের) রাস্তায় দাঁড়িয়ে থাকতে হয়।'

আচার/বেলুন

আনিচ ভাইয়ের আচার (আগে হাফিজুর নাম ছিল, আচারের সাথে মিলায়ে নিজের নাম নিজেই আনিচ রেখেছেন।) মোসলেম ভাইয়ের বেলুন ব্যবসার 'বারোটা' বেজেছে বর্তমানে সাভার থাকায়। কারণ ঢাকার স্কুলে, সংসদ ভবনে, পার্কের সামনে গেলে দুই ঘন্টায় যে আচার বিক্রি হতো সাভারে সারা দিনেও তা বিক্রি হয় না। এমন আরো অনেকের সাথে কথা হয়েছে যারা বর্তমান পরিস্থিতিতে ব্যবসাজনিত সমস্যায় আছে।

বস্তি উচ্ছেদ – বিত্তবানদের প্রেক্ষিতে

উচ্ছেদ পরবর্তী কল্যাণপুর বস্তিতে গিয়ে কেউ যদি পুরো বস্তি এলাকা চিনতে চায় তবে তাকে ৬নং ইউনিটে গিয়ে সমস্যায় পড়তে হবে। এখানে কোন বস্তির আলামত নাই, সবকিছু ঝকঝকে, পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন কারণ স্থানীয় কমিশনার (সরকার দলীয়) খুব সুন্দর করে প্রাচীর দিয়ে ঘিরে পুরো জায়গাটি দখল করে নিয়েছেন। তার কথা অনুসারে এই কাজ করার উদ্দেশ্য 'মহৎ' (!), বাংলা ভাষার প্রতি সম্মান দেখাতে হবে (!), ২১ ফেব্রুয়ারিতে এখন থেকে মহল্লার লোকজনকে যাতে ফুল দিতে আর দূরে যেতে না হয় সেজন্য হাতের কাছেই (দখলকৃত জায়গায়) শহীদ মিনার তৈরি করা হবে' (!)।

২০০৪ সালের ২৬ জানুয়ারি'র রাতকে বস্তিবাসীরা গজবের রাত হিসাবে চিহ্নিত করেন। কারণ রাতের বেলা পুলিশের ৪ জন ইনফরমার এবং ১২ জন পুলিশ এসে বস্তির ১১ জন পুরুষকে ধরে নিয়ে গেছে। 'যাকে পাও তাকে ধরো'- এই ভিত্তিতে দুইজন বৃদ্ধকেও ধরে নিয়ে গেছে। বেশ কিছু মহিলা তখন (তাদের কারো স্বামী, কারো ছেলেকে ধরে নিয়ে গেছে) এই অন্যায় গ্রেফতারের বিরুদ্ধে পুলিশকে বাধা দিতে গেলে তাদেরকে অমানবিকভাবে পেটানো হয়। চোখে, মুখে রক্ত জমা, পায়ের ব্যথায় ঠিকমত হাঁটতে না পারা বেশ কয়েকজন মহিলাকে আমি দেখলাম। সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হলো পুলিশ এবং তাদের ইনফরমাররা ঐ রাতের বেলা বস্তির মধ্যে হাঁড়ি-পাতিল, নতুন কাপড় পর্যন্ত লুট করেছে। রব চাচা পুলিশ দেখে জর্দার কৌটার মধ্যে টাকা রেখে বালিশের নিচে রেখেছিলেন, কিন্তু পুলিশ সেখান

থেকেও ঐ কৌটা বের করে টাকাগুলো নিয়ে গেছে। বস্তির সবাই ধারণা করছে, বস্তিতে ঘটা মারামারির কেসে এদের ঢুকিয়ে দেওয়া হবে।

নাম না রাখা বাচ্চাটির জন্ম বস্তিভাঙ্গার তিন দিন আগে। প্রচণ্ড ঠাণ্ডা, বারবার জায়গা পরিবর্তন, শুধুমাত্র পলিথিনের নিচে থাকায় ঐ শিশুটির মৃত্যু ঘটে। বস্তি উচ্ছেদ ও এরপর মাথা গোঁজার ঠাঁই হারানো ঐ বাচ্চাটির মা-বাবার পক্ষে কোনভাবেই ঐ বাচ্চাটিকে নিয়ে পলিথিনের তৈরি ঘরে থাকা ছাড়া এবং সামান্য তুলা দিয়ে বাচ্চাটিকে জড়িয়ে রাখার বেশি কিছুই করার ছিল না। – এই ঠাণ্ডায় (ঐ সময়ের) যথেষ্ট শীতের কাপড় থাকলেও যেখানে মানুষ বাইরে বের হতে চায় না সেখানে ঐ খোলা আকাশের নিচে পলিথিন দিয়ে তৈরি খুপড়ি ঘরে আর যাই হোক সামান্য তুলা সম্বল করে ঐ শিশুটির পক্ষে বেঁচে থাকা সম্ভব ছিল না। ঠাণ্ডায় বুকে কফ জমে যখন নিঃশ্বাস বন্ধ হবার উপক্রম তখন তাকে হাসপাতালে নিয়ে যাওয়ার বৃথা চেষ্টা করা হয়েছিল, পথেই শিশুটি মারা যায়। বাচ্চাটির দাদা আমাকে দেখে দৌড়ে এসে জড়িয়ে ধরে বলেন, 'আপনারা কি ..... ছিঁড়েন, এইসব ছবি তুলে পেপারে দিতে পারেন না?' আমি আমার পরিচয়, ক্ষমতা স্পষ্ট করে বলি, 'ছবি তুলতে পারি তবে পেপারে দিতে পারব না।' এরপরও তারা সবাই আমাকে ছবি তোলার জন্য অনুরোধ করে এবং আমি যখন ছবি তুলতে শুরু করি তখনই অদ্ভুত ঘটনাটি ঘটে – বাচ্চাটির মা গায়ে চাদর দিয়ে বাচ্চাটির পাশে গিয়ে ছবির জন্য রেডি হয়ে বসে।

বস্তির পাশেই ধনী লোক বসবাসকারী মহল্লার কিছু লোকের সাথে কথা বলেছিলাম বস্তির বিষয়ে। বস্তি উচ্ছেদ হওয়ায় তারা বেশ খুশি এবং এই ধরনের বস্তি উঠিয়ে দেয়া উচিত বলে মন্তব্য করেন। আমি নির্দিষ্ট করে খুশি হবার কারণ জানতে চাইলে তারা বলেন, 'যখন বস্তি ছিলো তখন ঠিকমত পানি আসত না, কারণ বস্তিবাসীরা বেশি পানি খরচ করে ফেলতো। আবার বিদ্যুতের ভোল্টেজ সবসময় কম থাকতো কারণ বস্তিবাসীরা বেশি বিদ্যুৎ চালাতো।' মজার ব্যাপার হলো বস্তির কিছু মানুষ নিজেদের ঘরের ভাঙ্গা ইট এখনও কিছু কিছু জমিয়ে রেখেছে – যদি বস্তি ওঠে যায় তখন কাজে লাগবে। আমি অনেক সময়েই লক্ষ্য করেছি মহল্লার ধনী লোকজন ছোট বাচ্চাদেরকে ৫/১০ টাকা দিয়ে ঐ বস্তির ইট একটা একটা করে এনে নিজেদের বাড়ির আঙ্গিনায় জমিয়ে রাখে – হয়ত নিজের ৪ তলার উপর আরেক তলা করার সময় এই ইট কাজে লাগবে।

বস্তি উচ্ছেদের পর বস্তির অনেক লোকের কাছে একটি কথা শুনে খুব অবাক হয়েছি। 'স্যার মনে করেছিলাম কল্যাণপুর এলাকাতেই থাকব, মায়া পড়ে গেছে এই এলাকার জন্য। কিন্তু বস্তি উচ্ছেদের পরপরই স্থানীয় বাড়িওয়ালারা তাদের ঘরভাড়া বাড়িয়ে দিয়েছে কারণ তখন সবাই বুঝে গেছে ঘর ভাড়া নেওয়ার লোকের অভাব নাই।' কয়েকজনের সাথে আমার কথা হয় তারা খুবই দুঃখ করে বলেন, 'বস্তিতে ছিলাম শুনলে লোকজন ঘরভাড়া দিতে চায় না, কয় তোমাগো পোলাপান বেশি, জায়গা নোংরা কর, তোমাগো দেখলে ঘেন্না করে।'

বেশিরভাগ এনজিও কর্মী, মহল্লার লোক, বস্তির লোক, স্থানীয় দোকানদার বস্তি উচ্ছেদের দিনে একটি কাজের খুব সমালোচনা করে থাকেন – 'একদিকে বুলডোজার দিয়ে ঘরবাড়ি ভাঙ্গছে অন্যদিকে বস্তিরই লোকজন নিজের ঘরসম্পদ সামলানোর চেয়ে নজর ঐ বস্তির নলকূপ, লেট্রিন, টিন, রাস্তার ইট, পানির ট্যাংকির ঢাকনা, এগুলোর দিকে, এবং কার আগে কে খুলে নিতে পারে সে প্রতিযোগিতা চলে। তাদের অপেক্ষা করা দরকার ছিলো। আবার যদি বস্তি বসে তখন সমস্যা যাতে না হয়?' – নিজের পায়ে

নিজেরা কুড়াল মেরেছে, বলেও অনেকে মন্তব্য করেন। অনেকে দুঃখ করেন, 'এতদিনের সাজানো গোছানো বস্তিটি চোখের পলকে মাটির সাথে মিশে গেলো। বুলডোজার আর কয়টি ঘর ভাঙ্গালো – নিজেরাইতো নিজেদের সব জিনিস নষ্ট করলো।' মাঠ কর্মের শেষের দিকে প্রকৃত ঘটনা উদ্ধার করি। বস্তিবাসীরাই ঐ কাজগুলো করেছে একথা ঠিক, কিন্তু এরা সবাই মালিক বস্তিবাসী – অর্থাৎ বস্তিতে এদের অনেক ভাড়া দেওয়া ঘর ছিলো এবং বস্তির ক্ষমতাচর্চার শীর্ষেই এদের অবস্থান ছিলো। একথা জানতে পারি বস্তিতে ঘটা দুইটি মারামারি থেকে। এই মারামারি হলো ঐ ইট, টিন, নলকূপ বিক্রির টাকার ভাগ নিয়ে। একপক্ষ আরেকপক্ষকে গালিগালাজ করছে আর অনর্গল বলে যাচ্ছে কিভাবে নলকূপ, টিন বিক্রির টাকা কম দিয়ে তাকে ঠকানো হয়েছে, 'দুই গাড়ি ইটের হিসাব ঠিকমত মিলছে না, এই কথা তো ছিল না যে, মনজের আলি ৬০০ টাকা 'গাড়ায়' (চুরি) দিবে।' এছাড়া প্রধান তথ্যদাতাদের কাছ থেকেও জানতে পারি ঐ ঘটনার সাথে প্রকৃত বস্তিবাসীরা জড়িত ছিল না, বস্তির নেতাদের ইন্ধনে এই কাজগুলো সেদিন ঘটেছিল এবং এই কাজের টাকার ভাগ নেতাদের পকেট পর্যন্ত ঠিকই পৌঁছে ছিল।

সরকারি জানোয়ার, আমেরিকা বনাম ইরাক

পুরো বস্তিতে একটা ঘরও নাই অথচ ১ ও ৫ নং ইউনিটের (মোট ৮টি ইউনিট ছিল বস্তিতে) সব ঘরগুলো সুন্দর অবস্থায় রয়েছে। মজার ব্যাপার হলো ভাঙ্গা অংশের অনেকেই আমার এই সংক্রান্ত প্রশ্ন করার পর ভাবতে বসে – আসলেই তো, ১ আর ৫ ভাঙ্গলো না কেন?

বেশিরভাগ লোক ছোটখাট কথায় ও উদাহরণে এই অসমতার কারণ ব্যাখ্যার চেষ্টা করে। 'চাচা আপনাগো জায়গা ভাঙ্গলো, ১ আর ৫ নং ইউনিট ভাঙ্গলো না কেনো?'- চাচা, '১ আর ৫ এ থাকে সরকারি জানোয়ার (সরকার সমর্থক, নেতা অর্থে) আর বাকি ইউনিটে আমরা যারা থাকতাম তারা গু-কপালে' (কপালে বিষ্টা লাগা/খারাপ কপাল)। এর বাইরেও বিভিন্ন ধরনের কথাবার্তা আছে – '১ ও ৫ এইচবিআরআই-এর জায়গা না, এটার মালিক মোট ৩০ জন। ঐ ৩০ জন ভাঙ্গার ব্যাপারে একমতে আসতে পারছে না বলে ভাঙ্গা হচ্ছে না। ১ ও ৫ সরকারের জায়গা ঠিকই, তবে এখানে শিশুপার্ক বানাবে, এর কাজ পরে শুরু হবে তাই এখন ভাঙ্গেনি। কমিশনারের নির্বাচন প্রতিশ্রুতি শহীদ মিনার তৈরি এবং এইচবিআরআই-এর জায়গা উদ্ধার করা, এর মধ্যে ১ ও ৫ পড়ে না বলে ভাঙ্গেনি।' ৩নং বস্তিতে চায়ের দোকানদারকে প্রশ্ন করি – কেন ভাঙ্গল না? '১ ও ৫ হলো আমেরিকা আর বাদবাকীগুলো হল ইরাক, আমেরিকা তো ইরাক ভাঙ্গেই' – দোকানদার বললো।

প্রধান তথ্যদাতা, এইচবিআরআই-এর একজন কর্মচারী এবং বেশ কয়েকজন বস্তিবাসীর কাছ থেকে প্রকৃত ঘটনা জানতে পারি। কমিশনারের লোক অর্থাৎ সরকার দলীয় বেশিরভাগ লোক থাকে ১ ও ৫ নং বস্তিতে। বিরোধী দল সমর্থক তাহের মোল্লা, হাশেম কনট্রাক্টর, নাগর আলীদের প্রভাব ছিল ভাঙ্গা অংশে এবং টাকার খনি খ্যাত এতিমখানা (লোকজনের দান, কোরবানির চামড়া, টাকা, পয়সা দিতো বলে) ছিলো ঐ ভাঙ্গা অংশে যেটার নিয়ন্ত্রণ (ম্যানেজিং কমিটি) ছিল এই গ্রুপের। তাছাড়া এই গ্রুপের লিডারদের অনেক ঘর ছিল ঐ ভাঙ্গা অংশে। অন্যদিকে সরকার সমর্থক রুহুল আমিন, মহসীনদের প্রভাব ও নিয়ন্ত্রণ এবং ঘর ছিল এই ১ ও ৫ নং-এ (না ভাঙ্গা অংশে)। এই গ্রুপ ঐ এতিমখানার নিয়ন্ত্রণ নেবার চেষ্টা করেছে বারবার কিন্তু সম্ভব হয়নি। সুতরাং অনিবার্য পরিণতি হিসাবে বস্তি ভাঙ্গার সময় ১ ও ৫ ভাঙ্গা হয় না। আবার আরেকটি যৌক্তিক ধারণার কথা অনেকে বলে থাকেন, 'আগে

একবার বস্তি ভাঙ্গার চেষ্টা করেছিলো। তখন সব লিডার (বিএনপি, আওয়ামীলীগ) এক হয়ে যাওয়ায় তা ভাঙ্গা সম্ভব হয়নি। তাই এবার আগে থেকে প্ল্যান করে বিএনপি-র লিডারদেরকে হাত করে, টাকা খাইয়ে তাদের অংশ ভাঙ্গা হবে না বলে চুক্তি করে, যাতে তারা বাকি অংশ ভাঙ্গতে বাধা না দেয়।'

আমার পর্যবেক্ষণ থেকে দেখেছি সরকার সমর্থক স্থানীয় নেতারা বেশ ভাল অবস্থাতেই ১ ও ৫ এ অবস্থান করছে। এই নেতারা যে সবাই ধনী বা অন্যান্য বস্তিবাসী থেকে আলাদা তা নয়, কিন্তু এই গরিবদের মধ্যেও (১ ও ৫ বনাম অন্যান্য ব্লক) যে রাজনৈতিক রং দিয়ে বিভেদ সৃষ্টি করা হয়েছে – এটা বেশ কৌতূহলোদ্দীপক বিষয়। 'হয়ত কয়েকদিন পর ১ ও ৫ ভেঙ্গে ফেলা হবে, কিংবা হঠাৎ করে আগুন লেগে যাবে' – বস্তি সম্পর্কে অনেক অভিজ্ঞ ব্যক্তিরা এই ধরনের সন্দেহ করে থাকেন। আমি এইচবিআরআই-এর অফিস থেকে জেনেছি ১ ও ৫ নং বস্তিও সরকারি জায়গা এবং শিশুপার্ক বানানোর কোন চিন্তাভাবনা নাই, তবে কেন ভাঙ্গা হল না সে সম্পর্কে পরিষ্কার করে কেউ কিছু বলে না।

বস্তিবাসীর সমস্যা – ধনীর সুবিধা – 'পরদেশী'

বস্তির এতগুলো লোকের রাতারাতি গৃহহীন হয়ে যাওয়া হলো এই 'বস্তি উচ্ছেদ'। লোকজন (অবশিষ্ট বস্তিবাসী) সবসময় সরকারি বা বেসরকারি কোন প্রকার সাহায্যের আশা করে থাকে। বস্তির কামাল চাচা আমাদের মতো শার্ট, প্যান্টওয়ালা ভদ্রলোক দেখলেই ভাবেন কোন সাহায্যের বা রিলিফের আলামত বুঝি – এসব ক্ষেত্রে তিনি একটি গান গেয়ে সবার দৃষ্টি আকর্ষণ করার চেষ্টা করেন –

"তোমার কি লাগে না দুঃখ ..?
আমাগোরে দেখি.....
ও... ও... ও... পরদেশী।"

তার সাথে কথা বলি, তার পরিষ্কার কথা, 'আল্লা বুড়া হয়ে গেছে, তা না হলে কি আর বস্তি ভাঙ্গে? সাদ্দামই কি আর ধরা পড়ে?' এই বস্তি যখন পুড়ে যায় তখনকার রিলিফ ব্যবস্থার দারুণ একটি গল্প তিনি আমাকে বলেন, বাংলাদেশের ক্ষমতাবান একজন রাষ্ট্রপ্রধানের স্ত্রী ক্যামেরা আর ১০০ টাকার ৮/১০টি নোট নিয়ে বস্তিতে আসে। ঐ নোটগুলো ৮/১০টি মহিলার হাতে দিয়ে ছবি উঠায়ে বারবার টিভিতে দেখায় আর বলে- লক্ষ, কোটি টাকা সাহায্য করা হয়েছে।'

বস্তিতে যার ঘর যে স্থানে ছিলো সেটা বাঁশ এবং পলেথিন দিয়ে অস্থায়ী ঘর করে দখল রাখার প্রাণপণ চেষ্টা করতে হচ্ছে। এমন কি বেদখল হয়ে যাবার ভয়ে সারারাত জেগেও বস্তিতে ঐ পলেথিনের নিচে অনেকে থাকছে। ফেরত পাওয়ারই নিশ্চয়তা নাই তারপরও সবাই সাধ্যমত চেষ্টা করছে। কিন্তু এই জায়গাগুলোও বেদখল হয়ে যাচ্ছে, আশেপাশের লোকজন এক বা দু'দিন কেউ জায়গা পাহারা না দিলে জায়গা দখল করে নিচ্ছে। ৫ জন প্রকৃত মালিকের সাথে কথা বলেছি যারা দখলকারীদের কাছ থেকে অনেক ঘোরাঘুরির পর ৫০০ টাকা করে দিয়ে জায়গা ফেরত নিয়েছে। যে জায়গার ভবিষ্যতেরই ঠিক নাই সেটা দখল রাখার জন্য এবং ফিরে পাওয়ার জন্য এই শীতের রাত জেগে পাহারা দেওয়া এবং টাকা দিয়ে দখলমুক্ত করা কৌতূহলোদ্দীপক। সবচেয়ে দুঃখজনক বিষয় হলো দখল রাখার জন্য বস্তিবাসীদের যে বাঁশ এবং পলিথিন দরকার, স্থানীয় বাজারে ঐ দুটি জিনিসের দাম বাড়িয়ে দেওয়া হয়েছে, ৫০ টাকার বাঁশ বর্তমানে ৮০ টাকা। কারণ ব্যবসায়ীরা জানে দাম বাড়ালেও বস্তিবাসীরা

প্রয়োজনের তাগিদে বাঁশ কিনবেই। অন্যদিকে বস্তিতে আগুনের ভয়ে সবাই ভীত কারণ আগারগাঁও বস্তির অভিজ্ঞতা থেকে সবাই বলে – একবার উচ্ছেদ হলে পরে আবার ঘর করলে আগুন দিয়ে দেওয়া হয়। 'কমিশনার আজ ২০০ লোক নিয়ে আসবে মারামারি করার জন্য। সরকার পুলিশ দিয়ে বস্তির চারিদিকে কাঁটাতারের বেড়া দিবে, এরপর সবাইকে গলা ধাক্কা দিয়ে বের করে দিবে। পুলিশ আসছে, যাকে পাবে তাকেই ধরবে, কেস দিবে, যে কোন সময় বস্তিতে আগুন দিতে পারে, – এধরনের ভীতিকর গুজব সবসময় বস্তির মধ্যে চলতে থাকে। মহিলারা সবসময় ঘরের পুরুষ সদস্যকে নিরাপদে রাখতে চায়। আমি দেখেছি – পুরুষরা ভাত খাচ্ছে, সেভ করছে, গোসল করছে – এমন সময় পুলিশ আসছে শুনে সবাই সবকিছু ফেলে দৌড় দেয়। আবার অনেক মহিলাকে দেখেছি স্বামী সন্তানকে বকাবকি করছে – বস্তিতে কেন এসেছে (বাইরে লুকিয়ে থাকতে বলে)। অবশিষ্ট বস্তিবাসীদের (যারা এখনও পলেথিনের ঘরের মধ্যে টিকে আছে) একটা বড় অভিযোগ হলো - 'রাতের বেলা আনছাররা ঘরের পলেথিন ধরে টান দেয়।' বস্তিবাসীর মতে এটা করার কারণ হলো যাতে ভয় পেয়ে বস্তির দখল ছেড়ে চলে যাই। এই যে গরিবের কষ্ট দেখে ধনী ও ক্ষমতাবানদের নির্বিকার থাকা এর উদাহরণ হল 'রাজাকারের বাচ্চা' (বস্তির মধ্যের ভাঙ্গাচোরা একটা ইটের ঘরের বাসিন্দা, যাকে বস্তির সবাই এই নামে ডাকে)। এই তথাকথিত 'রাজাকারের বাচ্চা'র সাথে কথা বলি তিনি সরকারি পানির পাম্প চালানোর সুবাদে, নিজেকে সরকারি চাকুরিজীবী বলে পরিচয় দিতে পছন্দ করেন। কথাবার্তার মধ্যে তিনি বস্তিসংক্রান্ত মতামত দেন – 'দুনিয়ার আকাম সব এই বস্তিতে হইতো, সরকারি জমি সরকার নিয়ে ভাল করেছে'। আমি প্রশ্ন করি, 'এই যে এতবড় বস্তি উচ্ছেদ হয়ে গেল, আপনি কি করলেন?' 'কি আবার করব? এই সব আকামে সরকারি লোকের যাওয়া চলে না।'

'হে আল্লাহ খা..লে...ক্যা কে সুস্থ করে দাও, হে যেন দেশে এসে আবার গরিবের ..... মারতে পারে।' বস্তির মধ্যে ঘুরছি এক মুরব্বি দেখি হাতে একটা পেপার (লোকাল এমপি এসএ খালেক চিকিৎসার জন্য বিদেশে রয়েছে, তার পরিবার পত্রিকায় তার ছবি দিয়ে দেশবাসীর কাছে দোয়া চেয়েছে, সুস্থতার জন্য) নিয়ে জোরে জোরে চিৎকার করে আল্লাহর কাছে মোনাজাতের ভঙ্গিতে উপরের কথাগুলো বলছে।

আগেই উল্লেখ করা হয়েছে রিলিফ এবং গুজবের কথা। আরেকটি ব্যাপার হলো 'লিস্ট করা' এবং 'ছবি তোলা'। বস্তিবাসীরা সবসময় বিভিন্ন এনজিও প্রতিনিধি এবং বিভিন্ন সংগঠনের লোকদের সম্মুখীন হয় (যারা অনেককেই ছবি উঠায়, ঘটনার নোট রাখে)। আমি দেখেছি ছবি উঠানো নিয়ে সমস্যা – 'উমুক স্যার আমার ঘরে কেন গেল না ছবি উঠাতে?' – এসব নিয়ে অনেক সময় ঝগড়া পর্যন্ত করে বস্তি-বাসীরা। একদিন এক বৃদ্ধা দৌড়াতে দৌড়াতে সেফ সেভ এনজিও'র এর অফিসে এসে বলে, 'ভূমি কী?' (সম্ভবত ভূমিহীনদের লিস্ট) এতে আমার নাম উঠায়ে নাও।' ভূমি কী কিছুই জানে না বৃদ্ধা, শুধু জানে ঐখানে নাম দিতে হবে।

নেতাদের খোলস পাল্টানো

মোবাইলসহ অন্যান্য মাধ্যমে তার সাথে যোগাযোগ করার চেষ্টা করে যখন ব্যর্থ তখন হঠাৎ শুনি আজ তিনি বস্তিতে আসবেন বিকাল সাড়ে তিনটায়। কারণ গতরাতে পুলিশ ১১ জনকে বস্তি থেকে গ্রেফতার করেছে। বস্তিতে একটা উৎসব ভাব, অনেকেই কাজে যায়নি, আমিও অপেক্ষা করে আছি আজ তার সাথে কথা বলব। ৩টা, ৪টা করে যখন ৫ টা বাজলো তখন তিনি আসলেন একটা কালো গাড়িতে

করে, সুন্দর টাই-কোর্ট পরে। এসেই ৪০/৫০ জন বস্তিবাসী, নারী-পুরুষের জটলার মধ্যে তিনি ঢুকে গেলেন। গতরাতের গ্রেফতারের খবর পেয়েই তিনি মহিলাদের উপর চোটপাট করতে লাগলেন, 'এতগুলো মহিলা, সবাই একটা করে জুতা মারলেও তো পুলিশ উড়ে যায়।' এই ধরনের পুলিশি ঝামেলায় তিনি মহিলাদেরকে লাঠি, জুতা, ইট নিয়ে এগিয়ে আসার জন্য ক্যারিসম্যাটিক কণ্ঠে উৎসাহিত করতে লাগলেন। এরপর দ্রুত তিনি কিছু কাজ করলেন, সবাইকে অভয় দিলেন, গ্রেফতার হওয়াদের ছাড়াবার ব্যবস্থা করবেন বলে কথা দিলেন। সমিতির তিনজন লিডারকে আড়ালে ডেকে কিছু বললেন। এরপর বললেন, 'কাদের নামে কেস আছে? আমার সাথে চলো থানায় নিয়ে গিয়ে পুলিশকে বলে দিবো, আর ঝামেলা করবে না।' তাড়াতাড়ি দুইজন গাড়িতে উঠে পড়লো, উনিও গাড়িতে উঠে চলে গেলেন। আমি বারবার চেষ্টা করলাম কথা বলার কিন্তু বস্তিবাসীদের চাপে এবং ভিড়ে সম্ভব হলো না। উনি চলে যাওয়ার পর শুরু হল ঝগড়া, কারণ ঐ জটলায় উপস্থিত প্রায় সব পুরুষ তখন নিজের কথা বলছে – 'আমাকে পুলিশ বেশি ডিস্টার্ব করে, আমাকে না নিয়ে ওদেরকে নিল কেন?' – এই ইস্যুতে। এমন সময় গতরাতে পুলিশের মার খাওয়া এক মহিলা দৌড়াতে দৌড়াতে আসলো, 'জামান সাহেব কই?' হাসতে হাসতে একজন উত্তর দিল, 'ঐ যে কালো গাড়ির ... (মানুষের পশ্চাদদেশ) দেখা যায়, ঐডার মধ্যে তোমার জামান সাহেব।' আমি কথা বলতে ব্যর্থ হলেও ঐ তিনজন লিডারকে জামান সাহেব কি বলে গেলো জানার চেষ্টা করি, 'চিন্তা করতে মানা করলো আর রাতে ২/১টি করে ঘর উঠায়ে ফেলতে বললো' – এর বেশি কিছু জানা সম্ভব হয়নি।

বাস্তুহারা সমাজ কল্যাণ সমিতির কলণ্যাণপুর বস্তির সভাপতির সাথে কথা বলি, 'কিভাবে জামান সাহেবের সাথে দেখা করা যায়?' তিনি আমাকে সিটি কর্পোরেশনের (কল্যাণপুর অফিসের) ঠিকানা দেন। সিটি কর্পোরেশন, কল্যাণপুর অফিসের কর বিভাগের প্রধান জামান সাহেবকে আমার পরিচয় এবং উদ্দেশ্য বলে স্যার সম্বোধন করায় তিনি খুশি হয়ে আমাকে চা খাওয়ান এবং পরের দিন বিকালে তার সংগঠনের হেড অফিসে (গুলিস্তান) আমাকে আসতে বলেন – 'কথা বলবো এবং প্রয়োজনীয় কাগজ দিবো।'

নির্দিষ্ট সময়ে অফিসে গিয়ে অবাক হই। বেশ বড় একটা ফ্লোর ভাড়া করে তাদের অফিস বানানো হয়েছে – অফিসে বড় বড় দুইটি পোস্টার একটিতে খালেদা জিয়া এবং অন্যটিতে শেখ মুজিব! অফিসের মধ্যে বড় একটা সাইনবোর্ড – 'সভাপতি এবং সেক্রেটারির চেয়ারে কেউ বসবেন না'। এরপর বিভিন্ন বিষয় নিয়ে আমি তার সাথে কথা বলি – বাড়ি কোথায়? বাবা কি করতেন? স্কুল জীবন, কলেজ জীবন, চাকুরি, সংগঠন সব বিষয়ে তিনি অনেক সময় নিয়ে নিজেই কথা বলেন এরমধ্যে তিনি বলেন, 'আপনারা (ব্র্যাক) আমাকে কি দিতে পারবেন? বস্তিবাসীদের জন্য। তিনি বারবার আমাকে বলেন, 'আপনার এনজিও থেকে ৫০০ বাঁশ দেন আমাকে, আমি রাতারাতি বস্তি দাঁড় করিয়ে দিব। তখন আপনাদের লোন (ব্র্যাকের ক্ষুদ্র ঋণ প্রোগ্রাম এই বস্তিতে ছিলো বলে উনার ধারণা) আবার তুলে নিতে পারবেন, আপনাদের (ব্র্যাকের) তো অনেক টাকা বস্তিতে পড়ে আছে। কিছু পেতে হলে কিছু দিতে হয়। ঐ টাকা যদি তুলতে চান তবে ৫০০ বাঁশ দেন আমাকে।' ওয়ার্ল্ড ফুড-এ তিনি ট্রেনিং করেছেন এটা নিয়ে যেমন উনি খুবই গর্বিত (বারবার সার্টিফিকেটটা আমাকে দেখান) তেমনি জাতিসংঘের কোন একটা কমিটি থেকে কিছু বাংলা পত্রিকা আসে তার নামে এটা নিয়েও তিনি বেশ খুশি। এছাড়া বাংলাদেশে বস্তিবাসীদের ভোটের অধিকার উনি এনে দিয়েছেন বলে দাবি করেন। তিনি সাংবাদিক সম্মেলন করেছেন কয়েকবার তাও বারবার বলেন। তিনি কল্যাণপুর বস্তি উচ্ছেদের দিনে কিভাবে অনেক চেষ্টা করেও বস্তিকে রক্ষা করতে পারেননি তার বর্ণনা দেন আর 'কল্যাণপুর' লেখা

ফাইলটা খুলে আমাকে কল্যাণপুর বস্তি সংক্রান্ত বিভিন্ন কাগজ (বিভিন্ন সময়ের পেপার কাটিং, কেসের কাগজপত্র, কল্যাণপুরের নিজের সংগঠন সংক্রান্ত কাগজপত্র ইত্যাদি) দেখাতে থাকেন। আমিও বেশ আগ্রহ ভরে কাগজগুলো দেখতে থাকি এবং আমার প্রয়োজনীয় কাগজগুলো আলাদা করতে থাকি। হঠাৎ একটি কাগজ দেখে আমি থেমে যাই – 'দলিল'। উসমান শেখের কাছ থেকে সরকার ১৯৬১ সালে এই বস্তির জমিটি অ্যাকোয়ার করে নেয় এবং ১৯৬৫ সাল পর্যন্ত সরকার কোন কাজে না লাগিয়ে ফেলে রাখে। দীর্ঘদিন পড়ে থাকার পর আবার সরকার বিহারীদের পুনর্বাসনের উদ্যোগ নেয় কিন্তু এটাও ব্যর্থ হয় এবং জায়গা খালি পড়ে থাকে। পরে ধীরে ধীরে বস্তি গড়ে ওঠে। সরকারি নিয়মানুযায়ী জমি অ্যাকোয়ার করার পর ৩ বছর কাজে না লাগিয়ে ফেলে রাখলে জমির মালিক সেটি আবার ফেরত পাবে। ঐ উসমান শেখ অনেক আগেই মারা গেছে এখন তার ওয়ারিশ বা উত্তরসূরিরা এই জমি ফেরত পাওয়ার চেষ্টা করছে। দলিলটি ছিলো এই উত্তরসূরিদের। এই দলিল আপনার কাছে কেন? আমার এই প্রশ্নে তিনি বিব্রত হন, দলিলটি লুকানোর চেষ্টা করে ব্যর্থ হন কারণ ততক্ষণে সেটি আমার হাতে। 'এই উসমান শেখের উত্তরসূরিরা জমি ফেরত পেলে বস্তিবাসীদের লস না? জায়গা ছেড়ে দিতে হবে না বস্তিবাসীদের? আমার এই প্রশ্নের জবাবে তিনি বিব্রত হন এবং বলেন, 'না অসুবিধা হবে না। এই মালিকপক্ষের সাথে আমার কথা হয়েছে, তাদেরকে জমি উদ্ধার করে দিতে পারলে একটু জমি বস্তি-বাসীদের জন্য ছেড়ে দিবেন, বস্তিবাসীরা সেখানে বিল্ডিং বানিয়ে থাকতে পারবেন।' উনার একটি মন্ত ব্য ছিল এমন, 'রুই, কাতলা (মন্ত্রী আমলারা) এই সোনার খনির (বস্তির জায়গা) জন্য মুভ করছে আর এইচবিআরআই তো নামকা ওয়াস্তে সাইনবোর্ড।'

তার কাছ থেকে বিদায় নেওয়ার সময় আবার দেখা করতে পারি বা আরো কথা বলতে পারি – এই কথা বলে তার ভিজিটিং কার্ড চাই। ড্রয়ার খুলে কার্ড বের করে বাছতে থাকেন, আমাকে একটা দিবেন। আমি ততোক্ষণে (দু'ধরনের) দু'টি কার্ডই হাতে নিয়েছি (বক্স ১), একটি কার্ডে আওয়ামী লীগ শব্দটি থাকলেও অন্যটিতে নাই। এর কারণ জানতে চাইলে তিনি বলেন, 'সুযোগ বুঝে লেবেল পাল্টাতে হয়।'

বক্স ১. সুযোগ বুঝে লেবেল পাল্টানো

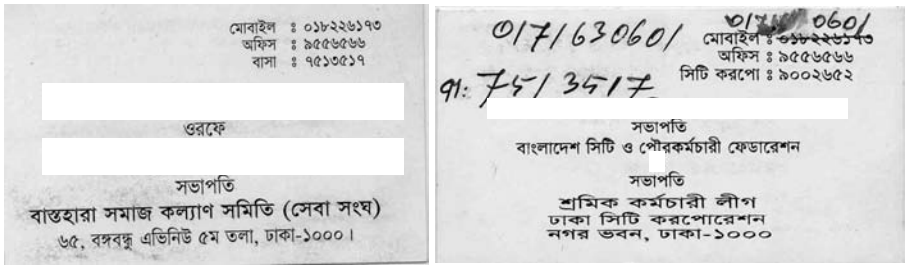

বিএনপি'র সময়ের কার্ড

আওয়ামী লীগ সময়ের কার্ড

সরকার বদলের সাথে সাথে তাদের লেবেল বদলে যায়, উনাদের অফিসে বড় দুইটি দলের (রাজনৈতিক) পোস্টার থাকে তারা বস্তিবাসীর পক্ষে আন্দোলন করে আবার সিটি কর্পোরেশনের মতো সরকারি চাকুরি করে। তারা বস্তিবাসীদেরকে বলেন রাতের বেলা ২/১ টা করে ঘর উঠিয়ে ফেলো আবার বস্তির প্রকৃত মালিকের কাগজপত্র রাখে এই শর্তে – জমি ফেরত পেলে, কিছু জমি বস্তিবাসী

পাবে। এদের উপরই আবার বস্তির নিরীহ লোকদের অসীম নির্ভরতা, এরাই আবার বস্তি ভাঙ্গার সময় লাঞ্চ ব্রেক দেয়!

বস্তির সংঘর্ষঃ পর্যবেক্ষণ বনাম পত্র-পত্রিকার বয়ান

এই গবেষণা কাজটি করার জন্য যখন বস্তিবাসীদের সাথে কথা বলি তখনই লক্ষ্য করি তারা তাদের এই কষ্টের সময়ে যে কয়টি উৎস থেকে সাহায্যের আশা করে তার প্রথম দিকেই আছে প্রচার মাধ্যম, অর্থাৎ তাদের এই অসহায়ত্ব পত্রিকাগুলো প্রচার করে সরকারসহ দেশবাসীর দৃষ্টি আকর্ষণ করবে। কিন্তু আমি বস্তিতে থাকাকালে বস্তিতে দু'পক্ষের মধ্যে সংঘটিত সংঘর্ষ এবং পত্রিকায় এ সংক্রান্ত রিপোর্ট পাশাপাশি রাখলে চাওয়া (তাদের) এবং বাস্তবতার তফাৎ সহজেই চোখে পড়ে।

বস্তিতে থাকাকালীন সময়ে আমার সামনেই সংঘর্ষের ঘটনাটি ঘটে। মারামারির একপক্ষে বস্তিবাসী, অন্যপক্ষে সরকার সমর্থক কমিশনার ও তার ক্যাডারবাহিনী, এইচবিআরআই-এর হর্তাকর্তা, আনসার এবং পুলিশ। যেহেতু বিষয়টি আমার সামনেই ঘটে সেজন্য প্রথম অংশ আমার নিজ চোখে দেখা। সংঘর্ষ এবং পরবর্তীতে এই সংক্রান্ত পত্রিকার রিপোর্টগুলো দেখলে বিষয়গুলো পরিষ্কার হবে। এদিন সকালে বস্তিতে গিয়েই বুঝতে পারি পরিস্থিতি কিছুটা থমথমে, কারণ ঠিকাদার, কমিশনারসহ অন্যরা বস্তিতে উপস্থিত হয়ে প্রাচীর দিয়ে ঘিরে ফেলার চেষ্টা করছে। অন্যদিকে বস্তিবাসীরা এই ঘটনায় উৎকণ্ঠিত। কারণ তারা জানে এই প্রাচীর শুধু প্রাচীর নয় এর সাথে তাদের অস্তিত্ব জড়িয়ে আছে। একবার প্রাচীর দেওয়া হয়ে গেলে জায়গাটি পুরোপুরি হাতছাড়া তথা রাতে মাথা গোঁজার ঠাঁইটুকুও হারিয়ে ফেলা। একদিকে বিক্ষিপ্ত, দুর্বল, ক্ষমতাহীন, নেতৃত্বহীন বস্তিবাসী অন্যদিকে ক্ষমতাবান, সংগঠিত, সবল ক্যাডার, পুলিশ, কমিশনারের নেতৃত্বে বস্তির মধ্যে সোফায় (কোথা থেকে সংগ্রহ করা হয়েছে জানি না) বসে পাশাপাশি (ক্যাডার এবং পুলিশের) অস্ত্র রেখে সিগারেট খাচ্ছে, গল্প করছে আর রাজমিস্ত্রী 'দেখ আমরা কত ক্ষমতাবান' – এমন ভঙ্গিতে প্রাচীর নির্মাণের কাজ চালিয়ে যাচ্ছে। দুঃখজনক ব্যাপার হলো ল্যাংড়া কামালের নেতৃত্বে একটা গ্রুপ (যারা কিনা বস্তিবাসী) কমিশনারের সাথে যোগ দিয়েছে। সবাই ধারণা করে টাকার লোভে এই অবস্থান। কিছু মহিলা জটলা করে আছে প্রাচীরের কাজ চলার স্থানে।

একদিকে প্রাচীরের কাজ চলছে অন্যদিকে বস্তির ভেতরের রাস্তায় এবং জায়গায় জায়গায় জটলা। আমি হাঁটতে থাকি, পরিস্থিতি দেখতে থাকি আর প্রায় সবগুলো জটলায় দাঁড়িয়ে তাদের (বস্তিবাসীদের) আলোচনার বিষয়বস্তু শুনতে থাকি।

জটলা-১

এখানে একজন বয়স্ক লোক কথা বলছেন আর বাকি সবাই মনোযোগী শ্রোতা হিসাবে শুনছেন। বয়স্ক লোকটির কথা হলো, 'যদি প্রাচীরের কাজ বন্ধ করতে হয় তাহলে মহিলাদের প্রথমে এগিয়ে গিয়ে বাধা দেওয়া উচিত, পরবর্তীতে আমরা মুরব্বিরা এগিয়ে যাব। কারণ পুলিশ মহিলাদের ভয় পায়, কিছু বলতে পারে না। আর মুরব্বিরা আগে সামনে গেলে পুলিশ গ্রেফতার করবে।' তার যাবতীয় ক্ষোভ মহিলাদের উপর - কেন এরা (মহিলারা) এগিয়ে যাচ্ছে না বাধা দিতে? দাড়ি, টুপিওয়ালা মুরুব্বি মাঝে

মধ্যে মহিলাদের গালিগালাজ করছে আবার মাঝেমধ্যে ছোট বাচ্চাদের পাঠাচ্ছেন পুলিশ আছে কিনা দেখে আসার জন্য, কারণ পুলিশ না থাকলে তিনি নাকি সামনে যাবেন এবং বাধা দিবেন।

জটলা-২

এই জটলায় আলোচনা হচ্ছে- যে পুলিশ এখানে এসেছে তারা কোন জাতের পুলিশ? রাস্তার? থানার? হাবিলদার? ওসি? নতুন ড্রেসের? দাঙ্গা? গুলির ওয়ার্ডার আছে? এসব বিষয় নিয়ে তর্ক করতে করতে প্রায় হাতাহাতির পর্যায়ে চলে যাচ্ছে। কেউ যদি বলে পুলিশের গুলির অর্ডার আছে তো অন্যজন বলে না নাই। কেউ যদি বলে রাস্তার তো অন্যজন বলে না এরা থানার পুলিশ। পুরো বস্তির মধ্যে এসময় এমএ জামান, এমএ জামান (বাস্তুহারা সমিতির সভাপতি) রব। সবার মুখেই শুনলাম – জামান সাহেবকে যদি খবর দেওয়া যায় (মোবাইল করে) তবে তিনি এসে প্রাচীর নির্মাণের কাজ বন্ধ করে দিতে পারবে। মোবাইলের দোকান থেকে চিৎকার করতে করতে একজন দৌড়ে আসে, 'জামান সাহেবরে খবর দেওয়া হয়েছে। হাইকোর্টের রায় অমান্য করে প্রাচীর নির্মাণ চলবে না, মোবাইল করেছি, জামান সাহেব আসছে।'

জটলা-৩

মহিলা, শিশু, যুবক, বৃদ্ধ-কে সামনে যাবে? তুমুল আলোচনা হচ্ছে এই বিষয়ে আর কখন জামান সাহেব আসবে, কখন নির্দেশ দিবে কি করতে হবে – এই ভরসায় সবাই অপেক্ষা করছে। সময় চলে যায় নেতা (জামান সাহেব) আর আসে না। কেউ কেউ আবার হতাশ হয়ে ফিরে যাচ্ছে – নাহ্ কিছুই করার নাই, প্রাচীর হবেই। কয়েকজন চিৎকার করে লোকজনকে সংগঠিত করার চেষ্টা করে এ ধরণের কথা বলে, 'তোমরা বের হয়ে আসছ না কেন? লাঠি, বাঁশ, ইট নিয়ে এসে বাধা দাও। কাওয়ালী দেখছো নাকি?' নেতা এখনও আসে না। বস্তির নামকরা গাঁজা সেবনকারী 'কবির' পুলিশকে মারাত্মক ভাষায় গালিগালাজ করতে থাকে। একজন লোক, কবির এর কথাবার্তায় অতিষ্ট হয়ে চুপ থাকার জন্য ধমক দেয়, 'চাপা মারছ ক্যা?' কবির উত্তর দেয়, 'আমি চাপার গুষ্টি চু...।' এ সময় সে সুন্দর করে অভিনয় করে দেখায় – কিভাবে বস্তির নেতারা টাকা খেয়ে চুপ করে গেছে। নিজেরা (লিডার) পেছনে থেকে সাধারণ মানুষদের 'ভোদাই' (বোকা) বানিয়ে সামনে এগিয়ে দিচ্ছে যাতে এরা কেস খায় ও সমস্যায় পড়ে।

জটলা-৪

কিছু বয়স্কা মহিলার একটা জটলা লক্ষ্য করি। আমি একটু এগিয়ে যেতেই শুনি এক বৃদ্ধা, সন্ত্রাসী ও সরকারের যোগসূত্র নিয়ে মুখরোচক ছড়া কাটছে। একজন বয়স্ক মহিলা আমাকে বলে, 'খালি খাতা কলম নিয়ে ঘোরাঘুরি কর। ঐখানে গিয়ে প্রাচীরের কাজ থামাতে পার না?' আমি আমার সীমাবদ্ধতার কথা উনাকে বোঝাতে থাকি। কিন্তু উনি আমার কথা ঠিকমতো না শুনেই, পরিষ্কার বাংলায় বলে দেন, 'বুঝছি, তুমি আমার হাওয়ার মরদ।' এক লোক ব্যস্তভাবে আমাকে ডেকে নিয়ে গিয়ে বলেন, 'ভাল করে পত্রিকায় একটা রিপোর্ট করে দেন।' উনাকে নিয়ে কথা বলার জন্য সেপ সেভ এনজিও'র অফিসের কাছে এসেছি – তখনই আরেকবার দৌড়ানি দিল। নির্মাণ কাজের পাশে লোকজন বেশি হয়ে

গেলে কমিশনারের লোকজন একটা করে দৌড়ানি দেয়, সবাই বস্তির ভেতরে ঢুকে যায় আবার আস্তে আস্তে ঐখানে একত্রিত হয়।

মজার ব্যাপার হলো, অনেক সময় চলে গেছে কিন্তু এখনও নেতা আসে নি (লিডারের জন্য সবাই অপেক্ষা করছে)। হঠাৎ গুলির শব্দ শুনি। এরপর জসিম ভাইয়ের পীড়াপীড়িতে (সেফ সেভ-এর ম্যানেজার) সেফ সেভ এর অফিসে (বস্তির পাশেই দোতালায়) চলে আসি এবং ব্যালকনীতে দাঁড়িয়ে মারামারির পুরো ঘটনাটি দেখি। যেটা এমন – বিভিন্ন দিক থেকে বস্তির লোকজন লাঠি, বাঁশ, ইট নিয়ে কাজের (প্রাচীর নির্মাণের) দিকে দৌড়ে যাচ্ছে। এরপর কমিশনারের লোকজন, পুলিশ, আনসার, মিস্ত্রীর দিকে ব্যাপক ইট পড়তে লাগল। আনসাররা তাদের পুরানো অস্ত্রগুলো ঘাড়ে তুলে ক্যাম্পের দিকে দৌড় দিলো, পরপর ৩/৪টি গুলির শব্দ এবং অল্প সময়ের মধ্যে কমিশনারের ক্যাডাররা পুলিশের সামনে দিয়ে, হাতে আধুনিক (পুলিশের চেয়ে) অস্ত্র নিয়ে, কেউ হাতে বাঁশ নিয়ে বস্তিবাসীদের তাড়িয়ে দিল এবং গুলি করতে লাগলো। বস্তির লোকজন তখন কোণঠাসা, ছত্রভঙ্গ, বিক্ষিপ্তভাবে বিভিন্ন দিক থেকে ইট মারার চেষ্টা করছে দুর্বলভাবে। ইতিমধ্যে আনসাররা সাহসী ভঙ্গিতে ভাঙ্গা বন্দুক ঘাড়ে করে মঞ্চে (বস্তিতে) উপস্থিত। কারণ বস্তিবাসীরা তখন তো মঞ্চ থেকে দূরে। পুলিশ এ সময় নীরব, সোফায় বসে কমিশনারের সাথে সিগারেট খাচ্ছে (পরে দোকানদারদের কাছ থেকে শুনেছি)। অনেক কষ্ট করে পলিথিন দিয়ে তৈরি বস্তির ঘরগুলো আমাদের চোখের সামনে ভাঙ্গাতে থাকে ক্যাডাররা – এ সময় মহিলা, শিশুদের দৌড়াদৌড়ি, চিৎকার শোনা যায়। উপস্থিত সবাই কেউ 'অমানবিক', 'সীমারের কাজ', 'অমানুষের কাজ', 'পশুর মত কাজ', – এ ধরনের শব্দ ব্যবহার করছিলেন। ইতিমধ্যে বস্তি বাসীদের কয়েকজন আবার সংগঠিত হবার চেষ্টা করে এবং ইট মারতে থাকে। লক্ষ্য করি – আনসাররা ভাঙ্গা বন্দুক ঘাড়ে করে দৌড় দিলো ক্যাম্পের দিকে। কমিশনারের ক্যাডারদের এবার সম্ভবত সম্মানে লাগে – 'এতবড় সাহস গুলি করি তবুও ইট মারিস'- এমন একটা রাগ থেকে আবার দ্বিগুণ সংখ্যায় গুলি করতে করতে বস্তির মধ্যে ঢুকে পড়ে এবং মহিলা, শিশু কোন কিছুই বাছবিচার করে না, যাকে পায় তাকেই পেটাতে থাকে। দুঃখজনক একটা ঘটনা আমরা ঐ ব্যালকনী থেকে দেখতে পাই – এক মহিলার পেছনে বাঁশ হাতে কয়েকটা ছেলে দৌড়াচ্ছে পেটাবে বলে – মহিলা দৌড়ে এসে প্রায় আমাদের সামনের একটা পলিথিনের ঘরের মধ্যে ঢুকে গায়ে লেপ জড়িয়ে নিলো, ঘরের সামনে চুলায় ভাত বা অন্যকিছুর জন্য পানি ফুটছিল সেই গরম পানির পাত্র ধরে ছেলেগুলো ঘরের মধ্যে ঢুকে মহিলার লেপের উপর ঢেলে দিল – সাথে সাথে মহিলা চিৎকার দিয়ে বাইরে বের হয়ে আসলো – মুখ, হাত সব পোড়া। ছেলেগুলো হাসতে হাসতে চলে আসল। মজার ব্যাপার হল নেতা তখনও আসেন নি!

পুরো বস্তির মধ্যে তখন পুলিশের সামনে, কমিশনারের লোকজন তাণ্ডব চালাচ্ছে। হঠাৎ বস্তির মসজিদের মাইক থেকে কেউ একজন চিৎকার করে বলতে থাকে, 'বস্তির ভাই-বোনেরা তোমরা লাঠি, বাঁশ, যাই পাও তাই নিয়ে বস্তির মসজিদের সামনে চলে আসো।' লোকজনকে সংগঠিত করার চেষ্টা করতে থাকেন তিনি। ক্যাডাররা বিপদ বুঝতে পেরে বস্তি ছেড়ে দিয়ে সবাই অস্ত্র হাতে ছুটে যায় মসজিদের দিকে এবং গিয়েই বাঁশ দিয়ে বিদ্যুতের তার বিছিন্ন করে দেয় যেন মাইকে আর লোকজনকে সংগঠিত করতে না পারে। এরপর লাঠি, বাঁশ হাতে নিয়ে কয়েকজন ক্যাডার জুতা খুলে মসজিদের ভেতরে প্রবেশ করে এবং ঐ মাইকে ঘোষণা দেওয়া লোকটিকে টেনে মসজিদ থেকে বের করে এনে পেটাতে থাকে। নেতা তখনও বস্তিবাসীদের সাহায্য করার জন্য আসেন নি। বস্তির কিছু লোকজন পিটানি খেয়ে দৌড়ে এসে সেফ সেভ অফিসের বিল্ডিং-এ উঠতে চায়। কিন্তু বাড়িওয়ালা

ঝামেলায় পড়তে চায় না, তাই মেইন গেটের দরজায় তালা লাগিয়ে দেন। যদিও লক্ষ্য করলাম পাশের বাড়িওয়ালা ঠিকই গেইট খুলে এই বিপদে পড়া লোকগুলোকে বাড়ির ভেতরে ঢুকতে দিলেন।

ব্যালকনী থেকে লক্ষ্য করছি এত ঘটনা ঘটে চলেছে, এর মধ্যেই এক মহিলা বাচ্চা কোলে করে নির্বিকার ভঙ্গিতে বসে কি যেন রান্না করছে। কয়েকজন এসে তাঁর ঘরে বাঁশ দিয়ে বাড়ি দিলো কিন্তু তিনি নির্বিকার, তাঁর যাবতীয় মনোযোগ ঐ ভাতের দিকে – অন্য কিছুতে তাঁর কিছুই এসে যায় না। হঠাৎ ২/৩ জন করে বেশ কিছুলোক বস্তির মধ্যের নদীর পাশে (পচা ধরণের ডোবা, সবাই নদী বলে) জড়ো হতে থাকে। আমি চিৎকার করে জানতে চাই কি হয়েছে? একজনকে মেরে, কমিশনারের লোকজন নদীতে ফেলে দিয়েছে। সবাই বড় বড় বাঁশ দিয়ে পানির মধ্যে খুঁজতে থাকে। হঠাৎ আবিস্কৃত হয় যাকে খোঁজা হচ্ছে সে নদীতে নয়- হাত, পা ভাঙ্গা অবস্থায় বস্তির মধ্যেই আছে। বস্তিবাসীরা সম্পূর্ণ কোণঠাসা, কমিশনারের লোকজন অস্ত্র উঠিয়ে ঘুরে বেড়াচ্ছে। এমন সময় আনসাররা আবার বন্দুক ঘাড়ে করে স্পটে প্রবেশ করলো। মজার ব্যাপার হল তখনও নেতা আসে নি। ধারণা করা হয় বিপদের সময়ে এরা আসে না। হঠাৎ দেখি পুরো বস্তির মধ্যে ছোটখাট ধরণের একটা লুটপাট শুরু হয়ে গেছে। বস্তির কিছু লোকজনই একাজের হোতা। বেশ কিছু লোকজনকে দেখি নিজেদের মালপত্র নিজেরা বেঁধে নিজেরাই পানির মধ্যে ফেলে দিচ্ছে। পরে জানতে পারি লুটের হাত থেকে মালপত্র বাঁচানোর এটা বস্তিবাসীদের পুরাতন একটা পদ্ধতি। উপর থেকেই লক্ষ্য করি অনেক লোকজন তাদের মালপত্র, বাচ্চা কোলে করে জায়গা ছেড়ে চলে যাচ্ছে কিন্তু তাদের সাথে কথা বলতে পারিনি কারণ নিচে তখন মারামারি।

মারামারি শেষে নিচে আসলাম, লক্ষ্য করি নিজেদের মধ্যে লোকজন আলোচনা করছে – আহতদের চিকিৎসা খরচ কে দিবে? নেতা কেন আসলো না? মারামারির সূত্রপাত নিয়ে যখন তথ্য বের করার চেষ্টা করলাম তখন লক্ষ্য করি বস্তিবাসীরা একই ধরনের কথা বলে, 'আমাদের মহিলাদের ওরা অপমান করেছে, তারপর মারামারি শুরু হয়ে গেছে।' অন্যদিকে নতুন বাজারে চায়ের দোকানে কমিশনারের দুই ছেলের (ক্যাডার) সাথে কথা হয় (মারামারি করে এসে চা খাচ্ছে)। তারা মারামারির সূত্রপাত সম্পর্কে বলে, 'বস্তির লোকজন এমপি খালেকের ছোট ভাই এবং কমিশনারের দিকে ইট মারে পরে মারামারি শুরু হয়।' পুরো মারামারি শেষে যদি লাভ-ক্ষতির হিসাব করা হয়, তা হলে এমন দাঁড়ায় – (ক) বস্তিবাসীদের পলিথিনের তৈরি ঘরগুলো ভেঙ্গে দেওয়া হলো। (খ) টিকে থাকার চেষ্টারত কিছু লোক বস্তি ছেড়ে চলে গেলো। (গ) নিরপরাধ কিছু লোক (বস্তিবাসী) আহত হয়ে হাসপাতালে গেল। (ঘ) প্রাচীর তৈরির কাজ থেমে গেল। (ঙ) পরের দিন কমিশনার বস্তিবাসীদের নামে, বস্তিবাসীরা কমিশনারের নামে থানায় কেস করলো এবং রাতে দুইজন মহিলাসহ ১৮ জনকে পুলিশ অ্যারেস্ট করে রিমাণ্ডে নিলো। গ্রেফতার হওয়া পরিবারগুলো বেশ ঝামেলার মধ্যে আছে। অন্যদিকে প্রাচীরের রড, ইট সবকিছু বস্তিবাসীরা খুলে নিয়ে গেছে। মারামারির ফলাফল থেকে দেখা যায়, বস্তিবাসীরা অনেকগুলো ক্ষতির সম্মুখীন হলেও তারা যে বস্তির প্রাচীরের কাজ থামাতে পেরেছে এটা বেশ বড় একটা ব্যাপার।

ঐদিনের পুরো ঘটনাটি ছিল এই রকম। আনসারদের ক্যাম্প ছিল বস্তি থেকে বেশ দূরে। পুরো মারামারির সময় এমন পরিস্থিতি কখনই সৃষ্টি হয় নি যে বস্তিবাসীরা আনসার ক্যাম্পে হামলা করে লুটপাট করে। মজার ব্যাপার হল, পরের দিন প্রায় সবকয়টি জাতীয় দৈনিকে এ সংক্রান্ত রিপোর্ট আসে। যদিও ২৫ হাজার লোকের থাকার জায়গা এই পোড়া বস্তি রাতারাতি উচ্ছেদ করে ২৫ হাজার

লোককে গৃহহীন করে দেওয়া হলেও সে সংক্রান্ত কোন রিপোর্ট তেমনভাবে কোন জাতীয় দৈনিকে আসেনি। রিপোর্টগুলোর শিরোনাম ছিল এমন – দৈনিক ইত্তেফাক ১৩ জানুয়ারি প্রথম পৃষ্ঠা – "ঢাকায় আনসার ক্যাম্প লুট–পুলিশের সঙ্গে বস্তিবাসীদের সংঘর্ষে আহত ৫০।" মূল রিপোর্ট হলো, "নগদ টাকা, ১৬ রাউণ্ড গুলি, বিপুল পরিমাণ মালপত্র বস্তিবাসীরা লুট করেছে।" দৈনিক প্রথম আলো ১৩ জানুয়ারি শেষ পৃষ্ঠায় বড় করে – "কল্যাণপুর বস্তিতে সংঘর্ষ, গুলি, লুট, ১৬ আনসারসহ ২০ জন আহত। মূল রিপোর্ট হলো – "মালামাল ও ১৬ রাউণ্ড গুলি লুট। কমিশনার ও এইচবিআরআই-এর লোকজনকে বস্তিবাসীরা ঘিরে ফেলে এবং এলোপাতাড়ি মারধর শুরু করে।" দৈনিক সংবাদ ১৩ জানুয়ারি প্রথম পৃষ্ঠায় বড় করে – "মিরপুর আনসার ক্যাম্পে হামলা। গুলি, পোশাক ও রেশন লুট – একজন আনসার আহত।" এদের রিপোর্টটি একটু অন্যরকম হলেও কিছুটা ভিত্তি আছে –"বস্তিবাসীরা গুলি, পোশাক ও রেশন লুট করে নিয়ে গেছে। কমিশনার শামীম পারভেজের নেতৃত্বে এই হামলা হয়েছে বলে অভিযোগ মিলেছে।" বস্তিবাসীদের মধ্যে অনেককে বলতে শুনেছি থানায় যাতে কেস করতে সুবিধা হয় সেজন্য কমিশনার তার ছেলেদের দিয়ে এই কাজ করিয়েছে যাতে কেস শক্ত হয়। দৈনিক ভোরের কাগজ ১৩ জানুয়ারি, প্রথম পৃষ্ঠায় বড় করে – "কল্যাণপুর আনসার ক্যাম্পে বস্তিবাসীর হামলা, গুলি, লুট – কমাণ্ডারসহ ২০ আনসার, ২ পুলিশসহ আহত ৫০।" এদের মূল রিপোর্ট – "বস্তি-বাসীরা আনসার ক্যাম্প ভাংচুর করেছে, ১৬ রাউণ্ড গুলি লুট করেছে, এবং মালামাল লুট করেছে।" দৈনিক যুগান্তর ১৩ জানুয়ারি শেষ পাতায় বড় করে – "বস্তিবাসীর হামলায় কল্যাণপুরে ৭ আনসার আহত।" এদের মূল রিপোর্ট হলো – "বস্তিবাসীরা বোমা ফাটিয়েছে, তাণ্ডব চালিয়েছে, লাঠি দিয়ে আনসারদের পিটায়েছে, আনসারদের মালামাল ও ১৬ রাউণ্ড গুলি নিয়ে গেছে বস্তিবাসীরা।" দৈনিক আজকের কাগজ ১৩ জানুয়ারি শেষ পৃষ্ঠায় বড় করে – "মিরপুর আনসার ক্যাম্পে উচ্ছেদ হওয়া বস্তি-বাসীদের হামলা, গুলি বর্ষণ, ১১ জন গ্রেফতার আহত ৩।" তাদের মূলকথা বস্তিবাসীরা আনসার ক্যাম্পে হামলা, ভাংচুর করেছে এবং ১৬ রাউণ্ড গুলি নিয়ে গেছে। দৈনিক মানবজমিন ১৩ জানুয়ারি ৮ নং পৃষ্ঠায় ছোট করে – "কল্যাণপুর আনসার ক্যাম্পে সন্ত্রাসী হামলা, ভাংচুর লুটপাট, ১৬ জন আটক।" মূল কথা গুলি ও লুট।

বক্স ২. সংঘর্ষঃ পর্যবেক্ষণ বনাম পত্র-পত্রিকার বয়ান

পর্যবেক্ষণ	পত্রিকার রিপোর্ট
ঘটনার সূত্রপাত প্রাচীর নির্মাণকে ঘিরে।	ঘটনার সূত্রপাত বিষয়ে নীরবতা।
নির্মাণাধীন প্রাচীরের কাছে বস্তিবাসীদের জটলা।	বস্তিবাসী কর্তৃক কমিশনার এবং এইচবিআরআই কর্মীদের ঘেরাও।
কমিশনারের ক্যাডার কর্তৃক জটলাকারীদের ধাওয়া।	বস্তিবাসী কর্তৃক আনসার ক্যাম্পে হামলা।
বস্তিবাসীদের ছত্রভঙ্গ করতে ক্যাডারদের হামলা।	আনসার ক্যাম্প থেকে বস্তিবাসীদের মালামাল ও গুলি লুট।
হামলায় বস্তিবাসীদের ঘরবাড়ি ভাঙচুরসহ অনেকেই আহত।	বিশজনের অধিক আনসার ও পুলিশ আহত।
কিছু বস্তিবাসী কর্তৃক লুটতরাজ।	
পুলিশ ও আনসারের ঘটনাস্থল হতে নিরাপদ দূরত্বে অবস্থান।	

দেখা যায় (বক্স-২) প্রত্যেকটি পত্রিকাতে কৌশলে ঘটনার মূল নায়ক কমিশনারকে বাদ দেওয়া হয়েছে যেন তিনি আদৌ বস্তিতে ছিলেন না। অন্যদিকে সবগুলো পত্রিকাতেই বস্তিবাসীদের সন্ত্রাসী হিসাবে, লুটেরা হিসাবে, আগে হামলাকারী, বোমাবাজ, অবৈধ দখলকারী হিসাবে দেখানো হয়েছে।

দুর্বলের প্রতিরোধ

এই মানবেতর পরিস্থিতিতেও দরিদ্র বস্তিবাসীরা নিজস্ব ধরনে ক্ষমতাবানদের বিরুদ্ধে প্রতিরোধ ও প্রতিবাদ জানানোর চেষ্টা করে যা বেশ কৌতুহলোদ্দীপক। বেশিরভাগ ক্ষেত্রে দেখা যায় বস্তি উচ্ছেদ মানে 'সকল বস্তিবাসী স্থানত্যাগ করেছে' এমন একটি সাধারণ ধারণা দেওয়া হয়। কিন্তু কল্যাণপুর বস্তির ক্ষেত্রে দেখা গেছে লোকজন দুইভাবে টিকে থাকার চেষ্টা করছে – (১) বস্তিতে থেকেই অথবা (২) স্থানত্যাগ করে। লেখার এ অধ্যায়ে 'বস্তিতে থেকেই' এর উপর আলোকপাত করার চেষ্টা করছি। কয়েকটি কেস স্টাডির মাধ্যমে বিষয়টি পরিষ্কার হবে যে উচ্ছেদকৃত বস্তিবাসীরা কিভাবে একদিকে ছোট ছোট ঘটনা ও গুজবকে আঁকড়ে ধরে টিকে থাকতে চায়। আবার অন্যদিকে মিছিল, ইচ্ছাকৃত ঝগড়া ও মারামারির মাধ্যমে ক্ষমতাবানদের চোখ রাঙানো উপেক্ষা করে ছোটখাট প্রতিরোধের মাধ্যমে টিকে থাকার চেষ্টা করে বস্তিতে।

ভিন্ন ধরনের মিছিল

'দুনিয়ার.....(গালি) এক হও' – এই ধরনের শ্লোগান দিয়ে মিছিল হয়েছে বস্তি উচ্ছেদের পর। অনেক পরিবারের বিকল্প থাকার জায়গা না থাকায় বস্তিতেই বাঁশ এবং পলিথিনের ঘরে অবস্থান করছে। টিকে থাকতে হলে মিছিল করতে হবে – এমন একটা ধারণা থেকে স্থানীয় নেতা ধরনের লোকজনের উদ্যোগে বস্তিতেই একটা মিছিলের আয়োজন করা হয়। বিকাল বেলা যখন মিছিল শুরু হয় তখন কাছ থেকে পর্যবেক্ষণ করেছি – আর দশটা সাধারণ মিছিলের মতো এটা ছিল না।

দশ/বারোজন মহিলা-পুরুষ দাঁড়িয়ে মিছিল শুরুর চেষ্টা করছে। কিন্তু লোকের অভাবে শুরু করা যাচ্ছে না। 'দুনিয়ার বস্তিবাসী এক হও' – চিৎকার দিয়ে যখন লোক জড়োর চেষ্টা করছে একজন তখন আরেকজন লোক পাশ থেকে বলে ওঠে, 'দুনিয়ার .....এক হও।' আমি ঐ লোকের কাছে জানতে চাই, 'এ কথা বললেন কেন?' জবাবে বলেন, 'এখন এত ফালাফালি করে লাভ আছে? বস্তি ভাঙ্গার দিন তো কেউ সামনে এগিয়ে আসলো না।' অনেককে জোর করে মিছিলে আনার চেষ্টা করলে বলেন, 'বনে বাস করে কুমিরের সাথে বিবাদ করে লাভ নেই।' এরপরও উদ্যোক্তারা দমে না গিয়ে দ্বিগুণ উৎসাহে মিছিল করার চেষ্টা করতে থাকে। এক সময় মিছিল শুরু হয়, যিনি স্লোগানের নেতৃত্ব দিচ্ছিলেন তিনি ঠিক মতো মিলাতে পারেন না, যেমন তিনি যদি বলেন, বস্তিবাসীর পুনর্বাসন চাই, তো সবাই বলছে শফিকুল ইসলাম জবাব চাই। একটা পর্যায়ে লিড দিতে থাকেন একটা কাগজ হাতে নিয়ে।

সবচেয়ে অবাক করা বিষয় হলো মিছিলের সামনে ৪/৫ জন বয়স্কা মহিলা, এরা সমস্ত শক্তি দিয়ে চিৎকার করছে, কোন স্লোগানের ধার ধারছে না আর শব্দ করে কান্নাকাটি করছে। দুই জন লোককে দেখলাম তারা মিছিল করছে না, কিন্তু বিভিন্ন সেকশন থেকে চিৎকার করে করে লোক জোগাড় করছে, 'ঐ ৮ নং-এর বেঈমানরা বউ নিয়ে ঘরে শুয়ে আছস ক্যান? মিছিলে আয়।'

বক্স ৩. কাগজ দেখে লিড দেওয়া

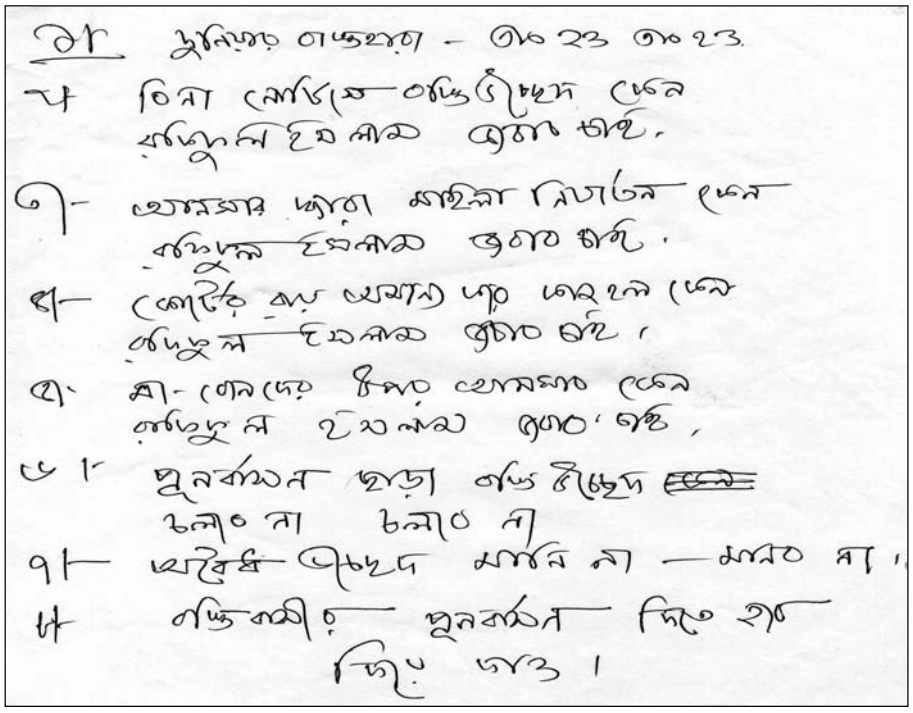

পুরো মিছিলে মহিলাদের উল্লেখযোগ্য অংশগ্রহণ থাকলেও বক্তব্য দেওয়ার সময় তারা শ্রোতা আর তিনজন পুরুষ নিজের ইচ্ছামত বক্তব্য দিতে থাকেন। নিজের বক্তব্যের মাঝে নিজেই থেমে বলেন, 'সুলোগান দে' সবাই বলে ওঠে, 'প্রশাসন জবাব চাই।' আবার একজন বক্তা হাতে লিখে এনে দেখে দেখে ৫টি মৌলিক অধিকার-এর কথা বলে উল্লেখ করেন, এগুলো সংসদে রাখা আছে – এগুলো দিতে সরকার বাধ্য।' আর্মি, বিডিআর আসার গুজবে কান না দেওয়ার জন্য সতর্ক করা হয়। রাতারাতি প্রাচীর যাতে না দিতে পারে সে বিষয়ে সতর্ক করা হয়। 'উপরে আল্লা, নিচে কামাল হোসেন' – এ ধরনের একক ব্যক্তির উপর ভরসাও তাদের বক্তব্যে প্রকাশ পায়।

বস্তির একলোক (বৃদ্ধ) একদিন ৪/৫ জনকে সাথে নিয়ে শিক্ষিত লোক খুঁজতে থাকে খালেদা জিয়াকে চিঠি লেখার জন্য। আমার সাথে দেখা হলে তাদের অনুরোধে আমি তাদের কথা অনুসারে নিচের চিঠিটি লিখে দিই। তারা নিশ্চিত এই চিঠি খালেদা জিয়াকে পাঠাবে, তিনি পড়বেন এবং বস্তি রক্ষা করবেন।

বক্স ৪. খোলা চিঠি

৭৮৬

আপা,

করুণ কাহিনী শোনেন, আমাদের বিহারীদের চেয়েও খারাপ অবস্থায় আপনি রেখেছেন। তারা রেশন পায়, পানি পায়, থাকার জায়গা আছে। আমাদের তো কিছুই নাই। আমরা কি এতবড় মূল্যহীন? আমাদের শুধু ভোট আছে – ঐডাও কেড়ে নিয়ে পুটকিতে লাথি দিয়ে, কয়ে দেন – পৃথিবীর কোনদেশে আমরা থাকব? আমরা মরলেও যে কাপড় পরবো, যে ঘরে থাকব, আপনি মরলেও ঐ ঘরে থাকবেন। তাহলে ভোটের আগে বলেছিলেন বস্তিবাসীদের পুনর্বাসন করব, সেই কথার বরখেলাপ করলেন কেন? আপা আপনি এই কমিশনারের মত চেলাবেলা সামলান, নইলে বিপদ। তোমার কি নাইরে দয়া.. ও.. নিষ্ঠুর ময়না।

– ইতি তোমার ভাই

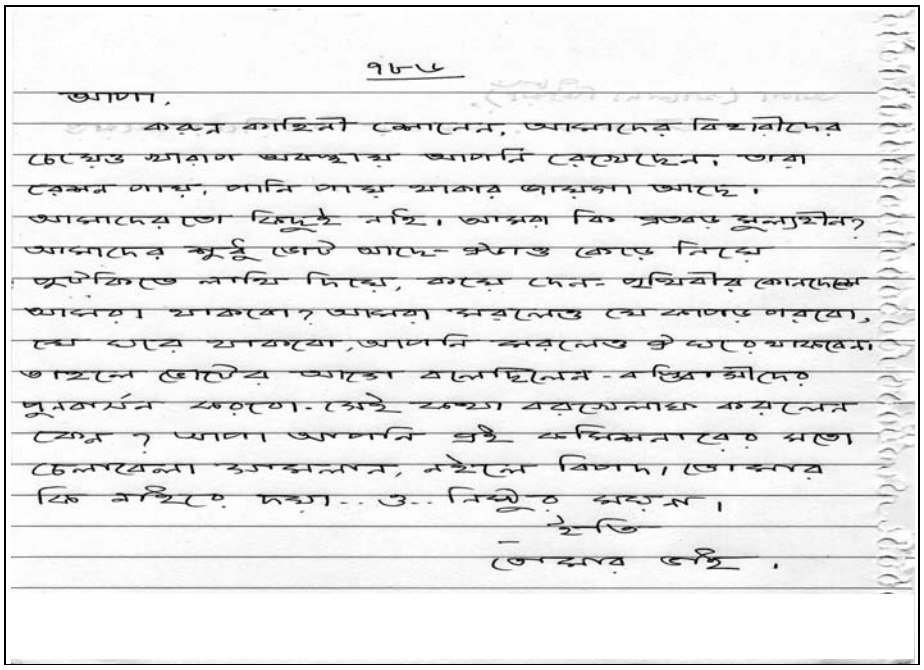

গাল কাটা মতিনের হুঙ্কার

বস্তির মধ্যে দোকানে বসে আছি। বস্তিতে ঘটা মারামারিতে কমিশনারের পক্ষ থেকে বস্তিবাসীদের বিরুদ্ধে গুলি করা দুইজন লোক হেঁটে যায় – সবাই তাকিয়ে থাকে, কেউ কিছু বলে না। তারা অনেক দূরে চলে যাওয়ার পর গালকাটা মতিন (সন্ত্রাসী নয়, নিরীহ বস্তিবাসী) চিৎকার করে গালিগালাজ করতে থাকে, 'আমার সাথে আর দুইজন লোক থাকলে ইট মেরে কু.. বাচ্চাদের মাথা ফাটিয়ে দিতাম' – এই কথা যখন বলে, আমি নিশ্চিত দেখেছি ঐ দুইজন যাওয়ার সময় গালকাটা মতিনের পাশে ৫/৬ জন লোক ছিল, যারা সবাই বস্তিবাসী।

মিরপুরের বন্ধু

বস্তির লোকজনের সাথে ভাল পরিচয় হয়ে যাওয়ায় মোটামুটি সবখানে যাওয়ার এবং সবকথা শোনার অনুমতি ছিল আমার। বেশ কিছু লোকের একটা মিটিং দেখে আমিও বসে পড়ি তাদের সাথে। তাদের আলোচনার বিষয়বস্তু বেশ কৌতুহলোদ্দীপক সামান্য এই মাথা গোঁজার ঠাঁইটুকু রক্ষা করার জন্য তাদের কি আকুলতা। কয়েকজন মিলে প্রস্তাব করে, 'আমরা সবাই লালটুর (ক্ষমতাসীন ছাত্রদলের সভাপতি) কাছে যাই। তার বাড়ি ভোলার শিবপুর, আমাদের বেশিরভাগ লোকের বাড়িও তো শিবপুর। তার কাছে গিয়ে আমরা সাহায্য চাইলে নিশ্চয় বস্তি টিকবে।' কয়েকজন হাওয়া ভবনে (ক্ষমতাসীন দলের পার্টি অফিস) গিয়ে নালিশ জানানোর প্রস্তাব দেয়। আরেকটা গ্রুপ যেভাবেই হোক ভোট পর্যন্ত টিকে (জায়গা দখল রাখার) থাকার প্রতি জোর দেয়, এবং যুক্তি দেখায়, 'ভোট হলো মধু আর লিডার/নেতারা হলো পিঁপড়া, টিকটিকি, বিড়াল, কুকুর। মধুর (ভোট) লোভে আমাদের (ভোটার) কাছে আসবেই, তখন ভোটের বিনিময়ে বস্তি বসায়ে নিব।'

নারীর প্রতিবাদ

০৭-০১-২০০৪ তারিখে বস্তিতে আনসার এবং বস্তিবাসীদের মধ্যে একটা মারামারি হয় এবং বস্তিবাসীদের ইট, লাঠির আঘাতে বেশ কয়েকজন আনসার আহত হয়। এই মারামারির কারণ হলো বস্তি ভাঙ্গার ফলে বেশ কয়েকটা পরিবার বস্তির পাশের খোলা জায়গায় উঁচু ঢিবিতে (এইচবিআরআই-এর জায়গা) পলিথিনের ঘর তৈরি করে থাকে। আনসাররা নিয়মিত বখরা নেয় ঐ পরিবারগুলো থেকে। সেদিন এক মহিলা সাহস করে রুখে দাঁড়ায় 'না টাকা দিব না।' তখন আনসাররা চুল ধরে ঐ মহিলাকে ক্যাম্পে নিয়ে যেতে থাকে, এতেই বস্তিবাসী ক্ষিপ্ত হয় এবং মহিলাদের অপমান করার অপরাধে আনসারের বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়ায়। আহত আনসারদের অবস্থা এতোই করুণ হয় যে, তাদেরকে পঙ্গু হাসপাতালে ভর্তি করতে হয়। এরপরের ঘটনা আরো জটিল। প্রত্যেক ইউনিটের ২/৩ জনের নামে আনসাররা কেস করে, এবং ঐ মহিলাসহ (যার চুল ধরে আনসাররা টেনে নিয়ে যায়) অনেক বস্তিবাসী বস্তি ছাড়তে বাধ্য হয় পুলিশের ভয়ে।

একটি লিফলেট ও নিজের ওজনের সোনা

কিছু গুজব মাঝে মাঝে বস্তির লোকদের মুখে মুখে ফিরে। এগুলোর উৎস কোথা থেকে জানা যায় না, কিংবা এগুলোর সত্যতা নিয়েও হয়ত সন্দেহ আছে। কিন্তু এগুলোর ক্ষমতা আছে – বস্তিবাসীদের মনোবল বৃদ্ধি এবং টিকে থাকতে, নতুন করে ঘর তুলতে উৎসাহিত করে। বস্তির মধ্যে একদিন সবার হাতে সংযুক্ত এই কাগজটি দেখি এবং সবাই বলতে থাকে আল্লাহর তরফ থেকে লোক পাঠানো হয়েছে, সে এসে সব অন্যায়ের বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়াবে, গরিবের উপর যারা অন্যায় করে, যারা বস্তি ভাঙ্গবে তাদের শেষ করে দিবে।

বক্স ৫. জরুরি খবর।

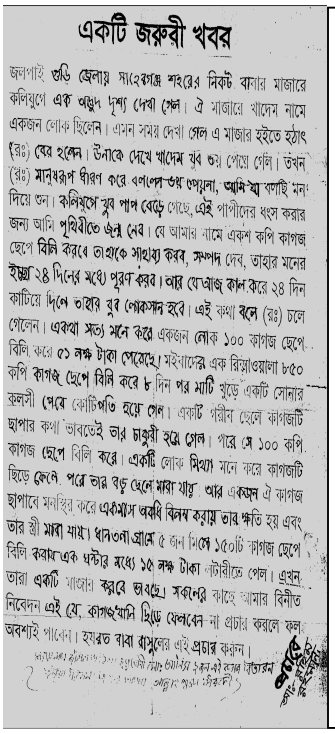

একটি জরুরী খবর

জলপাইগুড়ি জেলায় সাহেবগঞ্জ শহরের নিকট বাবার মাজারে কলিযুগে এক অদ্ভুদ দৃশ্য দেখা গেল। ঐ মাজারে খাদেম নামে একজন লোক ছিলেন। এমন সময় দেখা গেল এ মাজার হইতে হঠাৎ (রাঃ) বের হলেন। উনাকে দেখে খাদেম খুব ভয় পেয়ে গেল। তখন (রাঃ) মানুষরূপ ধারণ করে বললেন-ভয় পেওনা, আমি যা বলছি মন দিয়ে শুন। কলিযুগে খুব পাপ বেড়ে গেছে, এই পাপীদের ধ্বংস করার জন্য আমি পৃথিবীতে জন্ম নেব। যে আমার নামে একশ কপি কাগজ ছেপে বিলি করবে তাহাকে সাহায্য করব, সম্পদ দেব, তাহার মনের ইচ্ছা ২৪ দিনের মধ্যে পূরণ করব। আর যে আজ কাল করে ২৪ দিন কাটিয়ে দিবে তাহার খুব লোকসান হবে। এই কথা বলে (রাঃ) চলে গেলেন। একথা সত্য মনে করে একজন লোক ১০০ কাগজ ছেপে বিলি করে ৫১ লক্ষ টাকা পেয়েছে। মইবাদের এক রিক্সাওয়ালা ৮৫০ কপি কাগজ ছেপে বিলি করে ৮ দিন পর মাটি খুড়ে একটি সোনার কলসী পেয়ে কোটিপতি হয়ে গেল। একটি গরীব ছেলে কাগজটি ছাপার কথা ভাবতেই তার চাকুরী হয়ে গেল। পরে সে ১০০ কপি কাগজ ছেপে বিলি করে। একটি লোক মিথ্যা মনে করে কাগজটি ছিড়ে ফেলে, পরে তার বড় ভেলে মারা যায়। আর একজন ঐ কাগজ ছাপাবে মনস্থির করে একমাস অবধি বিলম্ব করায় তার ক্ষতি হয় এবং তার স্ত্রী মারা যায়। ধানতনা গ্রামে ৫ জন মিলে ১৫০টি কাগজ ছেপে বিলি করায় এক ঘন্টার মধ্যে ১৫ লক্ষ টাকা লটারীতে পেল। এখন তারা একটি মাজার করবে ভাবছে। সকলের কাছে আমার বিনীত নিবেদন এই যে, কাগজখানি ছিড়ে ফেলবেন না। প্রচার করলে ফল অবশ্যই পাবেন। হযরত বাবা রাসুলের এই প্রচার করুন।

একটি জরুরী খবর

জলপাইগুড়ি জেলার সাহেবগঞ্জ শহরের নিকট বাবার মাজারে কলিযুগে এক অদ্ভুদ দৃশ্য দেখা গেল। ঐ মাজারে খাদেম নামে একজন লোক ছিলেন। এমন সময় দেখা গেল এ মাজার হইতে হঠাৎ (রাঃ) বের হলেন। ওনাকে দেখে খাদেম খুব ভয় পেয়ে গেল। তখন (রাঃ) মানুষ রূপ ধারণ করে বললেন, 'ভয় পেওনা। আমি যা বলছি মন দিয়ে শোন। কলিযুগে খুব পাপ বেড়ে গেছে। এই পাপীদের ধ্বংস করার জন্য আমি পৃথিবীতে জন্ম নেব। যে আমার নামে একশ কপি কাগজ ছেপে বিলি করবে, তাহাকে সাহায্য করব, সম্পদ দেব, তার মনের ইচ্ছা ২৪ দিনের মধ্যে পূরণ করব। আর যে আজ কাল করে ২৪ দিন কাটিয়ে দিবে, তাহার খুব লোকসান হবে।' এই কথা বলে (রাঃ) চলে গেলেন। একথা সত্য মনে করে একজন লোক ১০০ কাগজ ছেপে বিলি করে ৫১ লক্ষ টাকা পেয়েছে। মইবাদের এক রিক্সাওয়ালা ৮৫০ কপি কাগজ ছেপে বিলি করে ৮ দিন পর মাটি খুড়ে একটি সোনার কলসী পেয়ে কোটিপতি হয়ে গেল। একটি গরীব ছেলে কাগজটি ছাপার কথা ভাবতেই তার চাকরী হয়ে গেল। পরে সে ১০০ কপি কাগজ ছেপে বিলি করে। একটি লোক মিথ্যা মনে করে কাগজটি ছিঁড়ে ফেলে, পরে তার বড় বোনের ছেলে মারা যায়। আর একজন ঐ কাগজ ছাপাবে মনস্থির করে একমাস অবধি বিলম্ব করায় তার ক্ষতি হয় এবং তার স্ত্রী মারা যায়। ধানতনা গ্রামে ৫ জন মিলে ১৫০টি কাগজ ছেপে বিলি করায় এক ঘন্টার মধ্যে ১৫ লক্ষ টাকা লটারীতে পেল। এখন তারা একটি মাজার করবে ভাবছে। সকলের কাছে আমার বিনীত নিবেদন এই যে, কাগজখানি ছিঁড়ে ফেলবেন না। প্রচার করলে ফল অবশ্যই পাবেন। হযরত বাবা রাসুলের এই প্রচার করুন।

'তুমি বস্তি ভাঙ্গতে গেলে কেন? তোমার এত টাকার দরকার ছিলো আমাকে বলতে, আমি আমার ওজন পাল্লায় মেপে, আমার মন্ত্রী বাবার কাছ থেকে সোনা এনে দিতাম। যাও তোমার ঘর করি না' – এই কথা বলে কমিশনারের বউ নাকি বাড়ি ছেড়ে চলে গেছে। আবার বস্তিভাঙ্গার অপরাধ ক্ষমা করতে না পেরে কমিশনারের মা ছেলেকে ফেলে চলে গেছে। কমিশনারের বউ বাড়ি গিয়ে তার বাবাকে (মন্ত্রী) বলেছে ঘর তুলে (বস্তিতে) দেওয়ার জন্য, মন্ত্রী কি আর মেয়ের কথা ফেলতে পারে? তাই সবাইকে ঘর তুলতে বলেছে। উপরের কথাগুলো বস্তির অনেকের মুখেই শোনা গেছে। কিন্তু কমিশনারের একজন ঘনিষ্ট লোকের সাথে আমার কথা হয়, আদৌ কমিশনারের শ্বশুর মন্ত্রী নয় কিংবা এমন ঘটনাও ঘটেনি।

জামান সাহেব (বাস্তহারার সভাপতি), কামাল মজুমদার (পরাজিত এমপি পদপ্রার্থী) সবাই বলেছে প্রত্যেককে রাতারাতি ২/৩টি করে ঘর তুলে ফেলো। পুলিশ কোন ঝামেলা করবে না। আমরা সামলাবো যদি করে। এসব কথাও বস্তির অনেকে বলে থাকেন।

গরিবের ভাবনা, প্রেক্ষিত – মসজিদ, বেয়ারা, তোফায়েল

- উচ্ছেদ পরবর্তী কল্যাণপুর বস্তির দিকে তাকালে দেখা যাবে শুধু খালি মাঠ কিন্তু মাঝখানে একটি মসজিদ মাথা উঁচু করে দাঁড়িয়ে আছে। বস্তির যে কোন লোকের কাছে এর কারণ জানতে চাইলে ব্যাখ্যা দিবে, 'মসজিদ ভাঙ্গার জন্য বুলডোজার লাগিয়েছে সাথে সাথে চাকা পাংচার হয়ে গেছে। আবার নতুন বুলডেজার লাগিয়েছে, আবার চাকা পাংচার হয়ে গেছে, তখন ড্রাইভার (বুলডোজারের) ম্যাজিস্ট্রেটকে বলেছে – স্যার আমি এই মসজিদ ভাঙ্গতে পারব না। তাই এটা ভাঙ্গা হয়নি। সব আল্লার কেরামতি।' যদি প্রশ্ন করা হয়- এই ঘটনা কে দেখেছে? পাশের এতিমখানা ভাঙ্গার সময় কেন চাকা পাংচার হল না? হাজার হাজার নিরীহ লোকের ঘর ভাঙ্গার সময় কেন চাকা পাংচার হলো না? ঐ ঘটনার প্রত্যক্ষদর্শী কাউকে পাওয়া যাবে না, সবাই এই ঘটনা শুনেছে, আর পরের প্রশ্নগুলোর ক্ষেত্রে উত্তর দিতে না পেরে বিরক্ত মুখে সবাই তাকিয়ে থাকে।

- বস্তিবাসীরা সবাই এই বস্তি ভাঙ্গার জন্য প্রধান ভূমিকা পালনকারী হিসাবে 'বিহারি' এবং এর স্থানীয় প্রধান শফিকুল ইসলামকে বলে থাকে। প্রায় সবারই প্রধান রাগ এদের উপর, বিহারি হল –এইচবিআরআই (হাউজ বিল্ডিং রিসার্চ ইন্সটিটিউট)। বস্তিবাসীরা কোনভাবেই এই উচ্ছেদের পেছনের উদ্দেশ্য ও রাজনীতি নিয়ে ভাবতে চান না। এমনকি অনেকে বলে থাকেন সরকারও চায়নি এই বস্তি ভাঙ্গুক কিন্তু 'বিহারি' এবং শফিকুল ইসলাম এই বস্তি ভেঙ্গেছে।

- বস্তির হযরত আলী বস্তি ভাঙ্গার আগের দিন মিটিং-এর সময় সবাইকে বলেছেন, 'আপনাদের কোন চিন্তা নাই। আমি আছি, আমার বাড়ি তোফায়েলের (সাবেক মন্ত্রী) বাড়ির পাশে। তোফায়েলের সাথে কথা হয়েছে আমার। বস্তি যদি ভাঙ্গতেই হয় তাহলে আমার কাছে শুনে, অনুমতি নিয়ে তারপর ভাঙ্গবে।' উনার এই কথা বিশ্বাস করে, অনেকে বস্তি ভাঙ্গা হবে না এই মর্মে নিশ্চিত হয়ে ঘরে ফিরে আসে। এখন বস্তির মধ্যে গাঁজাখুরি কথার জন্য হযরত আলী সবার কাছে হাসির পাত্র।

বস্তিতে এক রাত

মাসের পর মাস বস্তিবাসীরা খোলা আকাশের নিচে পলিথিনের তৈরি ঘরে বসবাস করছে এক্ষেত্রে একটি মাত্র রাত সেখানে থেকে, তাদের জীবনের বর্তমান অবস্থার বাস্তবতা বোঝার চেষ্টা করা যদিও কঠিন, তবুও এই গবেষণা কাজের অংশ হিসাবে ২৫-০১-২০০৪ তারিখ রাতে বস্তিতে থেকে বর্তমান অবস্থা পর্যবেক্ষণ করার চেষ্টা করা হয়। 'তেমন কোন ঘটনা ছাড়াই হয়ত রাতটি কাটবে' এই ধারণা নিয়ে সন্ধ্যার সময় বস্তির মধ্যের দোকানে যখন বসি তখন লক্ষ্য করি চারদিকে অন্ধকার নামার সাথে সাথে অনেক মহিলা বদনা হাতে দৌড়াদৌড়ি করছে (সংখ্যাটি ২/৩ জন হলে স্বাভাবিক মনে হতো কিন্তু এটা যখন ১৫/১৭ জন হয় তখন আর স্বাভাবিক থাকে না)। এর কারণ জানতে পারি – 'বস্তি ভাঙ্গার সাথে সাথে এখানকার স্যানিটেশন ব্যবস্থাও ভেঙ্গে পড়েছে, দিনের বেলায় যেহেতু একপ্রকার খোলা জায়গায় টয়লেট সারতে হয় সেহেতু মহিলাদেরকে অপেক্ষা করতে হয় এই অন্ধকারের জন্য'।

ঘটনাহীন একঘন্টা পার করার পর লক্ষ্য করি ১০/১৫ জন লোক দৌড়াচ্ছে একজনকে ধরতে – আমিও এগিয়ে গেলাম দেখার জন্য। ততক্ষণে ধরা হয়েছে তাকে। পনের মিনিট পর ডিউটিরত পুলিশ যখন

তাকে লোকজনের হাত থেকে উদ্ধার করে তখন তার সারা গায়ে রক্ত এবং বামহাতটি সম্ভবত ভাঙ্গা। পুলিশ যখন তাকে নিয়ে বটগাছের সাথে বাঁধে তখন জানতে পারি ঐ লোকটি একজনের রিকশা নিয়ে পালিয়ে যাচ্ছিলো, এমন সময় তাকে ধরা হয়েছে। এরপরের অংশের প্রধান অভিনেতা পুলিশ। দুই পুলিশ অল্প সময়ের মধ্যেই ৪টি কাঁচা ডাল লোকটির পিঠে ভাঙ্গলো। এসময় পুলিশ লোকটিকে অনবরত গালি দিয়ে যাচ্ছে এবং প্রত্যেকটি গালিতে 'বাচ্চা' কমন থাকছে। অন্যদিকে ঐ লোকটি ক্যাঁ... ক্যাঁ ধরনের একটা শব্দ করে যাচ্ছে অনবরত। পুলিশ, 'কু... বাচ্চা চুরি করেছিস?' লোকটি, 'হ্যাঁ'। পুলিশ, 'বাড়ি কই?' লোকটি, 'বরিশাল'। পুলিশ, 'খা... বাচ্চা তুই আমার বরিশালের সম্মান শেষ করলি, স্বরাষ্ট্রমন্ত্রীর বাড়ি বরিশাল, আর তুই বরিশালের লোক হয়ে চুরি করলি।' এ কথা বলে ঐ পুলিশ দ্বিগুণ উৎসাহে মারতে থাকে- সপাৎ, সপাৎ শব্দ হয়। ঐ লোকটির ক্যাঁ... ক্যাঁ.. শব্দ ক্রমেই বাড়ছে। জটলার মধ্য থেকে একজন বলে ওঠে, 'কিসের বরিশাল? চোরের বাড়ি আবার বরিশাল, কু.. বাচ্চার বাড়ি পাকিস্তান।' (এই লোকের বাড়িও বরিশাল নিশ্চিত হয়ে সবাই হাসাহাসি করে)। 'ভাই চুরি করতে গেলেন কেন?' – এই প্রশ্ন করে আমি যখন চোরের পাশে বসে পড়েছি তখন সবাই হি হি করে হাসছে আমার কথা শুনে। আমিও নাছোড়বান্দা, ঐ লোকের মুখ থেকেই শুনবো কেন সে চুরি করলো? আদৌ সে চুরি করেছে কিনা। এক সময় ঐ লোক সরল স্বীকরোক্তি দেয়, '৫ মাস হলো এই বস্তিতে এসেছি, রিকশা চালাইতাম। মালিক রিকশা দেয় না বস্তিভাঙ্গার পর থেকে। জমা শেষ ৯০ টাকা দিয়ে হেরোইন খাইছি। চাল কেনার টাকা নাই, তাই চুরি করছি।' এ কথা যখন বলা হলো, সপাৎ-সপাৎ দুইটি কাঁচা ডালের বাড়ি পড়ল ঐ ব্যক্তির পেছন দিকে (পুলিশের দেওয়া)।

আরো বেশ কিছুটা সময় পার করে আবার যখন বস্তির মধ্যে ঢুকি, তখন দেখি বিভিন্ন জায়গায় মহিলা, পুরুষ ও শিশু পচা টায়ার, পলিথিন, চট, কাগজ, প্লাস্টিক দিয়ে আগুন জ্বালিয়ে শরীর গরম রাখার চেষ্টা করছে। এই দৃশ্যের ছবি তুলতে গেলে একজন মন্তব্য করেন, 'এই আগুন তো আপনারা বড় লোকেরা জ্বালাইলেন, আবার আপনারা বড় লোকেরাই ছবি তুলছেন।' এই কথার উত্তর দেওয়ার আগেই লক্ষ্য করি পুকুর পাড়ে কে যেন চিৎকার করছে। দৌড় দেই সেদিকে। প্রচণ্ড এই ঠাণ্ডার মধ্যে একবৃদ্ধ গায়ে একটা ছেঁড়া লুঙ্গি জড়িয়ে শীত থেকে বাঁচার চেষ্টা করছে আর জোরে জোরে কমিশনারকে (যাকে লোকজন বস্তি ভাঙ্গার হোতা মনে করে) উদ্দেশ্য করে অশ্রাব্য গালিগালাজ দিচ্ছে।

রাত গভীর হতে থাকে, বিচ্ছিন্ন কিছু রান্নার প্রচেষ্টা লক্ষ্য করতে থাকি। চুলা জ্বালিয়ে ঐ আগুনে মাছ, তরকারি কুটে (কাঁটে) আবার ঐ আগুনেই রান্না করতে থাকে। ছোট বাচ্চা 'ভাত খাব... ভাত খাব....' কান্নাকাটির শব্দ শুনে একটি পলিথিনের ঘরের সামনে আসি। ঘটনা এমন 'যেদিন বস্তি ভাঙ্গে সেদিন অন্য মালপত্র বাঁচাতে গিয়ে কখন যে হাঁড়ি-পাতিল সব লুট হয়ে গেছে খেয়াল করেনি তারা, এখন নতুন করে হাঁড়ি-পাতিল কেনার পয়সা নাই সেজন্য চিঁড়া, পাউরুটি, কলা ধরনের শুকনা খাবার খেতে হচ্ছে যাতে হাঁড়ি-পাতিল লাগে না – এজন্য ঐ বাচ্চাটি ভাত না খেতে পেয়ে কান্নাকাটি করছে।'

রাত যখন ১০টা বাজলো তখন লক্ষ্য করতে থাকি পুরো বস্তি আস্তে আস্তে পুরুষ শূন্য হতে থাকে। এর কারণ হলো রাতের খাওয়া খেয়ে সব পুরুষ লোক ঘুমানোর জন্য নিরাপদ জায়গায় চলে যাচ্ছে যেকোন সময় পুলিশ ধরে নিয়ে যেতে পারে এই ভয়ে। ১২ জন লোকের সাথে কথা বলি কেউ বন্ধুর বাড়ি, কেউ পাশের মহল্লায়, কেউ বা আবার আত্মীয়ের বাড়ি চলে যাচ্ছে। কয়েকজন আবার ঘুমানোর জায়গা বলতে ইচ্ছুক নয়। উপস্থিত মামুন তার অভিজ্ঞতা জানায়, 'কয়েকদিন আগে রাতের বেলা পুলিশ বস্তির

কাছ থেকে ধরে নিয়ে – মিরপুর ১নং গিয়ে ছেড়ে দেয়। তবে এমনি এমনি ছাড়েনি। কুত্তায় যেমন হাড্ডি চায়, পুলিশও টাকা চায়, কাছে থাকা ৩০ টাকা নিয়ে তারপরই ছেড়ে দেয়।'

আমাদের পাশ দিয়ে দুইটি কুকুর হেঁটে যায়। পাশ থেকে একজন ঐ কুকুর দুইটিকে দুইজন স্থানীয় লোকের নাম ধরে ডাক দেয়, যাদের তাঁরা বস্তি ভাঙ্গার জন্য দায়ী বলে মনে করে। প্রায় মাঝরাত তেমন কোন শব্দ কানে আসে না, একা একা বস্তির মধ্যে ঘুরি। টিভি, পত্রিকা, নাটকে, ছিন্নমূল মানুষজনের শীতের কষ্ট আমরা দেখতে অভ্যস্ত – আমিও এতদিন এ দলেই ছিলাম। কিন্তু এই রাতে বুঝি আসলে বিষয়টি দেখার কিছু নয় এটা অনুভবের। প্রচণ্ড ঠাণ্ডা, পলিথিনের নিচে যখন বসি তখন হাত-পা জমে আসে, অন্যদিকে হাতে-মুখে মশার আক্রমণ। হঠাৎ খেয়াল করি একটি চটের মালিকানা নিয়ে দুই পক্ষের ঝগড়া। আমির নানা আমাকে ডাকে। বস্তির মধ্যের ৫ হাত জায়গায় উনার পলিথিনের দোকান। এখানেই খাওয়া, এখানেই রান্না, এখানেই ৪ ছেলেমেয়ে এবং চাচিসহ ঘুমানো। নানা তখনও জেগে আছেন, কেটলির শেষ কাপ চা আমাকে খাওয়ালেন। বিভিন্ন কথার মধ্যে আমাকে জানালেন (এ কয়দিনে উনার সাথে একটা ঠাট্টার সম্পর্ক সৃষ্টি হয়েছে)। -'নাতি তোমারে কি কই, বস্তি ভাঙ্গার পর থেকে তোমার চাচির লগে কাম (যৌন সম্পর্ক) করতে পারি না, বালবাচ্চা নিয়ে এক খাটের মধ্যে ঘুমাতে হয়।' যদিও উনিই একমাত্র যে আমার সাথে এই বিষয়টি নিয়ে কথা বলেন, কিন্তু বস্তির বর্তমান অবস্থা বলে দেয় অবশিষ্ট বেশিরভাগ পরিবারই এই সমস্যা অনুভব করছে।

সন্ধ্যা থেকে খেয়াল করছিলাম বস্তির মধ্যে পাশের ডোবা ছাপিয়ে পানি প্রবেশ করছে। কয়েক ঘন্টার মধ্যে সেই পানি দ্রুত বাড়তে লাগলো। কিছুটা সময় দোকানে বসে যখন আবার বস্তির মধ্যে প্রবেশ করলাম দেখতে পেলাম পানি শব্দ করে রাস্তার উপর দিয়ে বস্তির পলিথিনের ঘরে প্রবেশ করছে। দেখতে দেখতে অনেকের ঘরের মধ্যে পানি প্রবেশ করলো এবং লেপ-তোশক ভিজিয়ে দিল। অনেকেই ভেজা লেপ-তোশক নিয়ে বাইরে চলে আসলো এবং বিভিন্ন দিক থেকে ছুটে আসতে লাগলো কমিশনারকে উদ্দেশ্য করে দেওয়া ভয়ঙ্কর সব গালি। অন্ধকারে হাঁটতে গিয়ে আমার জুতা, প্যান্টে কাদা লাগলেও একটু পর যখন দেখি এক মহিলা ভেজা তোশক হাতে কাঁচা ঘুম ভেঙ্গে বাইরে এসেছে গালি দিতে দিতে, তখন আমার আর গায়ে কাদা লাগার কষ্ট থাকে না। একটা সময় এই ঘটনার কারণ উদ্ধার করি। 'পুরো মহল্লার পানি বের হওয়ার জন্য বস্তির সাথে যে কেন্দ্রীয় ড্রেন ব্যবস্থা ছিল তা আবার ঐ বস্তির ডোবার সাথে সংযুক্ত ছিল। কমিশনারের লোকজন সেটা বন্ধ করে করে দেওয়ায় এ অবস্থার সৃষ্টি হয়েছে। কোন ঘটনা ছাড়াই কিছু সময় কেটে যায়, দোকানের বেঞ্চে আমি আর আমার সাগরেদ (বস্তিরই ছেলে, পরবর্তীতে আমার বন্ধু হয়ে যায়)। তখনও পাশের বিল্ডিং-এ লাইট জ্বলছে জানালা দিয়ে দেখা যাচ্ছে লেপ গায়ে টিভি দেখছে লোকজন। সাগরেদ আমাকে প্রশ্ন করে, 'স্যার আমরা মফিজ নাকি? সারা রাত বসে থাকব?' হঠাৎ একটু দূরে বাঁশ ভাঙ্গার মট-মট শব্দ শুনতে পাই। দুই-তিনটি কুকুর শব্দ শুনে শব্দ করে ডেকে উঠে। সাগরেদকে সাথে নিয়ে সামনে যাই – আনসাররা, মানুষের ঘরের দখল বজায় রাখার জন্য দেওয়া বাঁশ ভাঙ্গতে থাকে। আমাকে দেখে পরিচয় জানতে চায়। আমি আমার পরিচয় দেওয়ার পর উনারা সম্ভবত কিছুটা বিভ্রান্ত হয়ে পড়েন, আমার 'ওজন' (পজিশন/ক্ষমতা) নিয়ে। এই শব্দে এবং কুকুরের ডাকে বেশ কয়েকজনের ঘুম ভেঙ্গে গেছে। তারা ঘুম থেকে উঠে বাঁশ ভাঙ্গা দেখে হঠাৎ হঠাৎ একটা করে গালি দেয়, জেগে উঠা মানুষগুলোর কাছে চলে আসি। এরা আস্তে আস্তে নিজেদের মধ্যে সরকার প্রধান, আনসার ও পুলিশকে তিরস্কার করে। একটু পর দেখি আনসাররা ঐ বাঁশ নিয়ে গিয়ে ক্যাম্পের সামনে আগুন জ্বালিয়ে নিজেদের শীত দূর করছে।

পু..উ..উ.. শব্দে বাঁশি দিয়ে পুলিশ ঢুকে আমি আর সাগরেদ দূরে দাঁড়িয়ে থাকি। তবে দূর থেকে দেখতে পাই তারা (পুলিশ) অকারণে এ ঘরে ও ঘরে বাড়ি দেয়, লাথি দেয়, আর গালি দেয়। একটু আগে আনসারদের শব্দে ঘুম ভেঙ্গে যারা আলো জ্বালিয়েছিলো তারা দ্রুত আলো নিভিয়ে দেয়। মজার ব্যাপার হলো, বস্তিতে পুলিশ ঢোকার পর কুকুরগুলো ডাকাডাকি বন্ধ করে দেয়। 'বস্তিবাসীরাই সবচেয়ে মারাত্মক গালি ব্যবহার করে' – আমার এই ধারণা ভুল প্রমাণিত করে বস্তিবাসীদের হটিয়ে পুলিশই সবচেয়ে মারাত্মক গালি ব্যবহারকারী হিসাবে স্বীকৃতি পায় (আমার কাছে)। পুলিশ বস্তি থেকে বের হয়ে যাওয়ার পর দূরে একটা ঘরে আলো জ্বলতে দেখে সেখানে যাই – চাচা-চাচি বসে আছে, পুলিশ নাকি আর্মি, দাঙ্গাপুলিশ নিয়ে আসবে বলে ভয় দেখিয়ে গেছে। উনারা জানান, 'সব পুলিশ এমন খাচ্চর না, মাঝে মাঝে কিছু পুলিশ আসে, তারা ভেতর দিয়ে ঘুরে চলে যায় – 'একজন আরেকজনকে বলে, মেহনত করে ঘুমাইছে, থাক কিছু কইস না।'

ফিরে এসে দোকানের বেঞ্চের উপর ঘুমিয়ে পড়ি (বসে থাকতে থাকতে ঝিমুনি ধরনের)। সাগরেদ আরো আগেই ঘুমিয়ে পড়েছে। চারদিকে একটু একটু আলো ফুটলে হাঁটতে থাকি, বাড়ি ফিরে আসার জন্য যথেষ্ট শীতের কাপড় থাকার পরও প্রচন্ড ঠাণ্ডা অনুভব করি, ঐ পলিথিনের নিচে থাকা লোকগুলোর ততক্ষণে কি অবস্থা হয়েছে তা আমার জানা ছিলো না।

উপসংহার

নাগরিক সভ্যতার উপজাত হিসাবে যে বস্তির উন্মেষ তা নগরের ক্রমবিকাশের সাথে সাথে তৈরি করছে 'নাগরিক অস্বস্তি'। এই অস্বস্তির একটি বড় কারণ এই বস্তিবাসীদের শ্রম আমাদের দৈনন্দিন জীবনে যেমন অপরিহার্য অংশ তেমনি এদের বসবাসের স্থান বস্তিগুলো নাগরিক জীবনে বিরক্ত উদ্রেককারি। কিন্তু এই বিরক্তি ও প্রয়োজনীয়তার দ্বন্দ্ব ভালো মত বোঝা যায় বস্তি উচ্ছেদের সময়। সন্ত্রাস, মাদক ব্যবসা এবং নাগরিক সৌন্দর্যের জন্য হুমকিস্বরূপ এই বস্তিগুলো উচ্ছেদ হলে আমাদের গৃহস্থ শ্রমিক, রিকশাওয়ালা, পাড়ার ক্ষুদে দোকানদার, কুলি, দিনমজুর, পরিচ্ছন্ন কর্মীদের আবাসনগুলোও উচ্ছেদ হবার সম্ভাবনা তৈরি হয়। এই সম্ভাবনার বাস্তব প্রতিফলন নিয়মিতভাবেই ঘটে, অর্থাৎ বস্তি উচ্ছেদ হয়। উচ্ছেদের সময় তাই বস্তিবাসীরা নিজে, উচ্ছেদকারী সরকারি বেসরকারি নানা প্রতিষ্ঠান, বস্তিতে নানা ইস্যুতে কাজ করা বিভিন্ন এনজিও এবং বস্তিবাসীদের পক্ষের রাজনৈতিক নেতৃত্বকে পড়তে হয় নানা টানাপোড়নে। যেখানে অনেক সময় যার যে ভূমিকা নেবার কথা সে ভূমিকায় দেখা যায় না। কিন্তু বস্তি নিয়ে যে সব আলোচনা ও পর্যালোচনা বিভিন্ন প্রচার মাধ্যম ও গবেষণা কর্মে আমরা পাই তা বেশির ভাগ ক্ষেত্রে বস্তিবাসীর বাইরের নানা অংশের মতামতের পরিবেশনা। এই পরিস্থিতিতে বস্তি উচ্ছেদকালীন বাস্তবতাকে বোঝার কাজটা একই সাথে দুরূহ কিন্তু প্রয়োজনীয় হিসাবে বিবেচনা করা হয়। এই প্রয়োজনীয়তার বোধ থেকেই এই গবেষণাটি সম্পাদন করা হয়েছে। বস্তি বা বস্তিবাসীদের নিয়ে আমাদের ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতা বা পত্রিকা ও নানা গবেষণার মাধ্যমে বস্তি সম্পর্কে আমাদের মধ্যে যে ধারণা সাধারণত তৈরি হয় এই গবেষণার মাধ্যমে তার কিছু ভিন্ন চিত্র তুলে আনার চেষ্টা করা হয়েছে। আরো নিবিড়ভাবে বোঝার জন্য অংশগ্রহণমূলক পদ্ধতিতে এই গবেষণাটি করা হয়েছে, যা প্রচলিত পদ্ধতির সীমাবদ্ধতা কাটানোর একটি ক্ষুদ্র প্রয়াস।

এখানে বস্তি উচ্ছেদকে বস্তিবাসীদের দৃষ্টিভঙ্গি থেকে দেখা হয়েছে। যেখানে চেষ্টা করা হয়েছে বস্তির উৎপত্তি ও ক্রমবিকাশ থেকে শুরু করে বর্তমান অবস্থাকে নিবিড় পর্যবেক্ষণলব্ধ উপাত্তের মাধ্যমে তুলে আনার। এ পর্যায়ে নিম্নে সম্পূর্ণ গবেষণা কাজটিকে সংক্ষেপে উপস্থাপন করা হচ্ছে:

- বাংলাদেশে বস্তির ইতিহাস অনুসন্ধান করে আমরা দেখতে পেলাম বৃটিশ ঔপনিবেশিক শাসনের প্রাথমিক প্রতিক্রিয়ার একটি অন্যতম ফলাফল হিসাবে বস্তির উদ্ভব। দুর্ভিক্ষ থেকে মুক্তির আশায় শহরের লঙ্গরখানায় এসে আশ্রয় নেয়া মানুষগুলো আর গ্রামে ফিরে না গিয়ে শহরেই বস্তি তৈরি করে থেকে গেলো। ব্রিটিশরা প্রত্যক্ষ শাসন থেকে চলে গেলো, পাকিস্তান হলো, এমনকি বাঙালি জাতির মুক্তির আশা নিয়ে বাংলাদেশ নামে নতুন রাষ্ট্রের উদ্ভব ঘটলো। কিন্তু এই প্রতিটি আমলেই যে ঘটনাটি ক্রমবর্ধমান হারে বেড়েছে তা হচ্ছে বস্তি ও বস্তিবাসীর সংখ্যা।

- বিভিন্ন আমলে বস্তি ও বস্তিবাসীর সংখ্যা বৃদ্ধি একই সাথে তৈরি করছে বস্তির নানা প্রকারভেদ (বৈধ-অবৈধ)। নগরের মধ্যে বসবাস করেও বস্তির ঘরগুলো নাগরিক চাকচিক্যের ঠিক বিপরীত। পৌরসভার সুবিধা অন্য নাগরিকদের জন্য যাই থাকুক না কেনো তা বস্তির সামনে আসলে কি

কারণে যেনো থেমে যায়। দেখা যায়, যে গ্রাম থেকে উচ্ছেদ হয়ে তারা শহরে এসে বস্তিতে আশ্রয় নিয়েছে সেই গ্রামের ঘরগুলোর মত বেশিরভাগ বস্তির ঘরগুলো কাঁচা এবং নিম্নমানের উপকরণে তৈরি। এর অধিবাসীরা যেমন আদি পেশা থেকে বিচ্যুত হয়ে অনভিজ্ঞ শ্রমিক হিসাবে শ্রমবাজারে টিকে থাকতে হিমশিম খায় তেমনি এদের শিক্ষা, স্বাস্থ্য, স্যানিটেশন ব্যবস্থা তথা সামাজিক পরিবেশের হালও নাজুক থাকে।

- বস্তিবাসীরা ভাসমান, সমস্যা সৃষ্টিকারী, অপরাধপ্রবণ, অবৈধ দখলকারী, পরিবেশ দূষণকারী, অর্থনীতি এবং উন্নয়নের প্রতি হুমকিস্বরূপ – এধরনের প্রচারণার রেওয়াজ এবং সমাধানের ব্যবস্থাপত্র হিসাবে বস্তি উচ্ছেদকে উৎসাহিত করা হয়ে থাকে প্রচ্ছন্ন রাষ্ট্রীয় পৃষ্ঠপোষকতায়। কিন্তু বাস্তবতা হিসাবে এই গবেষণায় দেখা গেলো, বস্তিবাসীরা বেশির ভাগ ক্ষেত্রে সমস্যা সৃষ্টিকারী তো নয়ই, বরং আমাদের এই আধুনিক শহুরে জীবনকে ক্রিয়াশীল রাখার জন্য তাদের অবদান অনেক। একইভাবে অবৈধ দখলকারীর প্রচারণাও খারিজ হয়ে যায়, যেহেতু বস্তিতে থাকার ভাড়া হিসাবে যে টাকা তারা প্রদান করে সেটা ঢাকা শহরের অনেক অভিজাত এলাকার চেয়েও বেশি।

- আন্তর্জাতিক চুক্তি, দেশের সংবিধান বা আইনকে বস্তি উচ্ছেদের ক্ষেত্রে বিবেচনায় আনা তো হয়ই না, খোদ উচ্ছেদ প্রক্রিয়াই অনেক বিতর্কের সূচনা করে। কারণ সেখানে মানবিকতা, বিবেচনাবোধ, মানবাধিকার, নাগরিক অধিকার এগুলোকে প্রশ্নের মুখে ফেলা হয়। বস্তিতে আগুন দিয়ে, পুলিশ দিয়ে জোর করে, সন্ত্রাসীদের দিয়ে বস্তিবাসীদের পেটানোর মাধ্যমে বস্তি উচ্ছেদ করা হয়। তাই উপরোক্ত ধারণাগুলো এক্ষেত্রে উপহাসের বিষয়ে পরিণত হয়।

- আলোচ্য গবেষণার আওতাধীন কল্যাণপুর বস্তি আঠারো বছর আগে সরকারি খালি জায়গায় ভোলার নদীভাঙ্গা লোকজন দিয়ে প্রতিষ্ঠিত হয়। এই বস্তি একাধিক বার উচ্ছেদ এবং আগুনে পুড়ে গেছে, কিন্তু প্রতিবারই বস্তিবাসীরা বস্তিকে আবারো নিজস্ব এবং সরকারি ও বেসরকারি প্রচেষ্টায় গড়ে তুলেছে। উচ্ছেদ পরবর্তী পুনরায় প্রতিষ্ঠার ঘটনায় বস্তিতে দীর্ঘদিনে তৈরি হওয়া ক্ষমতা কাঠামো সবসময়ই অঙ্গাঙ্গীভাবে যুক্ত থাকে। পার্টি অফিসকে কেন্দ্র করে সরকারি দল সবসময় বস্তির ক্ষমতা কাঠামোর শীর্ষে অবস্থান করে। যার চেহারা বাংলাদেশের অন্যান্য ক্ষেত্র থেকে ভিন্ন নয়। তবে যৌনব্যবসা এবং ড্রাগ নিয়ে প্রচলিত প্রচারণাকে প্রশ্নবিদ্ধ করেছে কল্যাণপুর বস্তি, কারণ বিভিন্ন তথ্য থেকে দেখা গেছে, সেখানে সীমিত মাত্রায় যৌনব্যবসা থাকলেও গাঁজার বাইরে উল্লেখযোগ্য কোন ড্রাগ ব্যবসা ছিলো না।

- কল্যাণপুর বস্তি উচ্ছেদের সময় সেখানকার রাজনৈতিক নেতৃত্বকে আপাতভাবে বস্তিবাসীদের পক্ষে অবস্থান নিতে দেখা গেলেও গবেষণায় দেখা গেছে প্রকৃত প্রস্তাবে তারা বস্তি উচ্ছেদের কাজকে ত্বরান্বিত করার ক্ষেত্রে ভূমিকা পালন করেছে। বস্তিবাসীদের উন্নয়নের জন্য কাজ করতে আসা এনজিওরা রাষ্ট্রীয় ও রাজনৈতিক ক্ষমতার দাপটের সামনে নিতান্ত অসহায় হয়ে পড়ে। ফলে এনজিওরা নিজেদের অবকাঠামো (অফিস ও আসবাবপত্র) রক্ষা করা ছাড়া ভিন্ন কোন তৎপরতার সাথে উচ্ছেদের সময় যুক্ত থাকে না।

- নানা স্থান থেকে নানা পেশার মানুষ জীবনের স্থিরতা ও কিছুটা নিশ্চয়তার আশায় বস্তিতে বসবাস শুরু করেছিল। কিন্তু বস্তির উচ্ছেদ এই ন্যূনতম সম্ভাবনার পথটিও বন্ধ করে দেয়। উচ্ছেদের পর বস্তিবাসীদের স্যানিটেশন, পয়ঃনিষ্কাসন, পানি সরবরাহ ব্যবস্থাসহ সব কিছুই ভেঙ্গে পড়ে। ক্ষুদে ব্যবসা, যৌনকাজ, যানবাহন চালকসহ সকল পেশার ক্ষেত্রেই তৈরি হয় অস্থিতিশীলতা ও ভয়াবহ

সংকটজনক পরিস্থিতি। এই পরিস্থিতিতে যারা সবচেয়ে কার্যকরী ভূমিকা পালন করতে পারতো সেই এনজিওদের ভূমিকা ছিল হতাশাব্যঞ্জক ও বস্তিবাসীদের কাছে বেশ বিতর্কিত।

- বস্তি উচ্ছেদের পর বস্তিবাসী ও বস্তিবর্হিভূত মানুষদের ভূমিকা বা প্রতিক্রিয়া খুবই গুরুত্বপূর্ণ। যেখানে দেখা গেছে, বস্তি উচ্ছেদ হবার ফলে শুধুমাত্র বিদ্যুৎ ও পানির সরবরাহ বিচ্ছিন্ন হবার কারণে আশপাশের মহল্লাবাসী বেশ খুশি। আর অন্যদিকে বস্তি থেকে উচ্ছেদ হবার পর বস্তি-বাসীদের পড়তে হয় নানান দুর্বিপাকে। এখান থেকে উচ্ছেদ হয়ে তারা নতুন এলাকায় গেলে সেখানে তাদেরকে চাঁদাবাজি, যাতায়াত ব্যয় বৃদ্ধি, প্রয়োজনীয় মুহূর্তে এনজিও সেবা না পাওয়াসহ (স্বাস্থ্য, শিক্ষা, স্যানিটেশন, ক্ষুদ্র ঋণ) নানা সমস্যায় পড়তে হয়। একপ্রকার মানবেতর জীবনযাপন করতে হয়। মহিলাদেরকে টয়লেটে যাবার জন্য অপেক্ষা করতে হয় সন্ধ্যা পর্যন্ত, আর তা না হলে বিকল্প থাকে দিনের বেলায় খোলা জায়গায় পুরুষের সামনে টয়লেট সারার। অন্যদিকে অস্বাস্থ্যকর এবং সীমিত উৎস থেকে খাবার পানির জন্য লাইন দিতে হয় আর গোসল করার সময় পুরুষের বিকৃত দৃষ্টিতে তাকিয়ে থাকা সহ্য করতে হয় মহিলাদের। একইভাবে বাচ্চাদের স্কুল এবং অর্থনৈতিক বিপদে অর্থের উৎস এনজিওদের অভাবও তারা অনুভব করে।

- বস্তির রাজনৈতিক অর্থনীতিকে বাংলাদেশের রাজনৈতিক অর্থনীতির সাথে তুলনীয় বলে আমার মনে হয়েছে। যেখানে উচ্ছেদের সময় কৃত্রিমভাবে বেড়ে যায় বাঁশ বা পলিথিনের মূল্য, নিজের বাস্তুভিটা রাত জেগে পাহারা না দিলে প্রভাবশালী কেউ দখল করে নিতে পারে। আর দখল ছাড়াতে হলে দিতে হয় নগদ অর্থ। সমগ্র বস্তি ভাঙ্গার কথা বলা হলেও রাজনৈতিকভাবে প্রভাবশালীদের ইউনিটগুলোতে (৮টি ইউনিটের মধ্যে ২টি ইউনিটে) বুলডোজারের স্পর্শ পর্যন্ত লাগে না। বস্তির অধিবাসীরা সমগ্র দেশবাসীর মতই দুর্যোগের সময় রিলিফের আশায় বসে থাকে। সাংবাদিক বা মিডিয়ার লোক দেখলেও মনে করে 'এই বুঝি রিলিফ এলো'। আর বস্তির জনপ্রিয় রাজনৈতিক নেতা যথারীতি বস্তি থাকলেও সেখান থেকে সুবিধা নেয়, আর বস্তি ভাঙ্গার সময়েও সেখান থেকে সুবিধা নিতে কার্পণ্য বোধ করে না।

- পত্রিকার বয়ানের সত্যাসত্য নিয়ে আমাদের বেশির ভাগ পাঠকের অন্ধ আস্থা থাকে। কিন্তু এই গবেষণায় 'বাস্তব অবস্থা' আর 'পত্রিকার ভাষ্যকে' সম্পূর্ণ বিপরীত অবস্থায় দেখা গেছে। যেখানে সরকারি (পুলিশ, আনসার) ও বেসরকারি (মাস্তান) পেটোয়া বাহিনী সম্মিলিতভাবে বস্তি-বাসীদেরকে পেটালেও পত্রিকার ভাষ্যে উল্টো বস্তিবাসীদেরকে আক্রমণকারি হিসাবে প্রমাণ করার প্রচেষ্টা লক্ষ্য করেছি। 'বস্তুনিষ্ট' ও 'নিরপেক্ষ' পত্রিকাগুলোর ভূমিকা এর মাধ্যমে প্রশ্নবিদ্ধ হয়।

- 'বস্তি ভাঙ্গে আর বস্তিবাসী উচ্ছেদ হয়ে অন্যত্র মাথা গোঁজার ঠাঁই খোঁজে' - এই প্রথাসিদ্ধ ধারণাকে এই গবেষণার মাধ্যমে নতুন করে ভাবার প্রয়োজনীয়তাকে সামনে আনার চেষ্টা করা হয়েছে। কেননা আমি দেখেছি বস্তি ভাঙ্গলে বস্তিবাসীরা শুধু পালিয়েই যায়না উল্টো ঘটনাও ঘটায়। অর্থাৎ প্রতিরোধও করে, সেই প্রতিরোধকে প্রচলিত সম্মিলিত প্রতিরোধের চিন্তা দিয়ে বোঝা যাবে না, যাকে 'দুর্বলের প্রতিরোধ' হিসাবে চিহ্নিত করা যায়। কেন না এই প্রতিরোধ ঘটেছে উচ্ছেদকারী কর্তৃপক্ষের কর্তা ব্যক্তিকে গালি দিয়ে, কুকুরকে তাদের নামে ডেকে, অসংগঠিত অথচ তীব্র ক্ষোভ নিয়ে করা ক্ষুদ্র মিছিলের মাধ্যমে। বস্তিবাসীরা উচ্ছেদের বিরুদ্ধে প্রতিরোধে না আসার কারণে পরস্পরকে গালিগালাজের মাধ্যমে উদ্দীপ্ত করার চেষ্টা করেছে। একইসাথে জলপাইগুড়ি থেকে কোন এক খাদেম এসে তাদের ত্রাণকর্তা হিসাবে আবির্ভূত হবে এমন ভাবনার পরিচয়ও আমি দেখতে পেয়েছি। সরকারের প্রত্যক্ষ প্ররোচনায় বস্তি উচ্ছেদ হলেও

সেই সরকার প্রধানের কাছেই চিঠির মাধ্যমে নিজেদের দুর্যোগ থেকে মুক্তির জন্য প্রার্থনা করে বা সরকার দলীয় ছাত্র নেতার কাছে যাবার চেষ্টা করে।

'বস্তি উচ্ছেদ' উপর থেকে দেখতে যতই সাদা কালো দেখা যাক, বাস্তবতা হিসাবে যে রঙিন সেডগুলো দেখা গেল, তা বেশ কৌতুহলোদ্দীপক। বস্তি উচ্ছেদকে ঘিরে বস্তিবাসীদের জীবনে বয়ে যাওয়া নানান জটিলতা এড়ানো যায় যদি আইন মেনে, যথাযথ পরিকল্পনার মাধ্যমে এগুনো যায়। সেক্ষেত্রে 'মাথা ব্যথা হলে মাথা কেটে ফেলার' নীতি থেকে সরে এসে 'মাথা ব্যথার' চিকিৎসার কথা ভাবতে হবে কর্তাব্যক্তিদের।

দুই বছর পর ফিরে দেখা – কল্যাণপুর বস্তি যেন পাথরকুচি পাতা

পুড়িয়ে দেওয়াই হোক আর উচ্ছেদ করাই হোক কল্যাণপুর বস্তিবাসীদের এই বস্তির সাথে যেন নাড়ির টান, একটা সময়ে ঠিকই তারা নিজেদের জায়গা নিজেরা করে নেয় এই বস্তিতেই। পাথরকুচির ঝরে যাওয়া পাতা থেকে যেমন নতুন গাছ বের হতে তেমন পরিচর্যা লাগে না, ঠিক তেমনি এই বস্তিবাসীরা সামান্য কোন সাহায্যকে পুঁজি করে বারবার ফিরে এসেছে কল্যাণপুরে।

২০০৩ সালের ২২ ডিসেম্বরে উচ্ছেদ হওয়া কল্যাণপুর বস্তিতে (৮টি ইউনিটের মধ্যে ২টি বাদে) ২ নভেম্বর ২০০৫-এ গিয়ে দেখা গেছে নতুন কিছু পরিবর্তন বাদে আগের অবস্থায়ই রয়েছে। নতুন এই পরিবর্তনের মধ্যে ইতিবাচক দিক হিসাবে দেখা যায় মালিকানা পরিবর্তন, অর্থাৎ বস্তি উচ্ছেদ হওয়ার আগে এর বাসিন্দদের বেশিরভাগই ছিলো ভাড়াটিয়া হিসাবে। বস্তির নেতা ধরনের মালিকদের একেকজন ১০ থেকে ১২টি পর্যন্ত ঘরের মালিক ছিলো, ১টি কিংবা ২টি ঘরে থাকতো বাকিগুলো ভাড়া দিতো। আবার অনেকক্ষেত্রে নিজেরা বস্তিতে থাকতো না পর্যন্ত, সবগুলো ঘরই ভাড়া দিতো আর মাস শেষে এসে ভাড়া নিতো। গবেষণাপত্রে দেখা গেছে, কিভাবে শুধুমাত্র বস্তির ক্ষমতা কাঠামোতে অংশগ্রহণের জন্য অনেকে নিয়ম রক্ষার্থে বস্তির মধ্যে ঘরের মালিক সেজে বসেছে। এ ধরনের বস্তি কাঠামো বিরাজমান থাকলেও বর্তমানে (উচ্ছেদের পর আবার স্থাপিত হওয়া) বেশির ভাগ ভাড়াটিয়া ঘরের মালিক হয়ে গেছে। কারণ শাহাবুদ্দিনসহ আরো কয়েকজন নেতার নেতৃত্বে আবার বস্তি স্থাপিত হওয়ার পর পূর্বের অধিবাসীরা যাতে সবাই থাকতে পারে এজন্য প্রত্যেকের নামে নির্দিষ্ট পরিমাণ জমি বরাদ্দ দেওয়া হয়েছে। যাদের দশ ঘরের জমি ছিল তারা কেন এই এক ঘরের জমি মেনে নিবে? এই প্রশ্ন করলে উত্তর আসে, 'নিজেরা গণ্ডগোল কইরা লাভ নাই, আগে সবাই টিককা নেই পরে কার জমি কতটুক সেইডা হিসাব করা যাইবো।' বস্তির ঘরমালিক এবং সেখানেই বসবাস করতো এমন বেশ কিছু লোকজনের সাথে কথা হয় যারা এখন মহল্লায় থাকেন, কারণ বারবার ঝামেলা ভালো লাগে না। তাছাড়া অনেকে, যারা ঘর ভাড়া নিয়ে থাকতো তারা অন্য বস্তিতে বা অন্য জায়গায় থাকার ব্যবস্থা করে নিয়েছে। অর্থাৎ যারা উচ্ছেদের পরও জায়গা পাবার জন্য পলিথিনের নিচে কষ্ট করে থেকে জায়গা দখলে রেখেছিল তারা প্রায় সবাই এখন জায়গার মালিক।

পুনঃস্থাপন পরবর্তী কল্যাণপুর বস্তির সবচেয়ে বড় নেতিবাচক দিক হলো অবৈধ দখলদার হিসাবে স্থানীয় সরকার দলীয় ওয়ার্ড কমিশনারের ভূমিকা অটুট থাকা। গবেষণাপত্রে উল্লেখ করা শহীদ মিনার তৈরির জন্য বস্তির যে জমি তিনি দখল করেছিলেন, সেটা এখনও নিজের দখলে রেখেছেন তিনি। অন্যদিকে বস্তির সৌন্দর্যহানি নিয়ে অনেককেই হতাশা প্রকাশ করতে দেখা যায়, 'সেই মহল্লার মতো সুন্দর এখন আর নেই।' বস্তির প্রত্যেক ইউনিটের মধ্যে আগে যেমন সুন্দর লেট্রিন, পাকা ড্রেন, পানি সরবরাহ ছিলো এখন সেখানে ভাঙ্গা রাস্তা আর দুর্গন্ধযুক্ত কাঁচা ড্রেন। তবে আচার বিক্রেতা থেকে শুরু করে ভাঙ্গাড়ির ব্যবসায়ী, হোটেল ব্যবসায়ীসহ সব পেশার লোকজনে বস্তি আবার সরব। জানার চেষ্টা করেছিলাম ব্যবসা এখন কেমন? 'আগের মতোই' জানায় তারা। বস্তির ড্রাগ ব্যবসা বিষয়ে কথা

বলেছিলাম 'এখন আগের চেয়েও কড়া, এখন গাঁজা পাওয়াও কষ্ট।' চায়ের দোকানদারসহ অনেকেই বললো, এখন বস্তির লোকজনই আগের চেয়ে অনেক সচেতন। কেউ মদ, গাঁজা বা অন্যকিছু বিক্রি করতে গেলে র‍্যাব, পুলিশকে খবর দেয় আমার সামনেই দেখতে পাই দুইজনের সামান্য মারামারির ঘটনায় তৃতীয় আরেক জন, স্থানীয় থানার নম্বরে ফোন করে, 'রায়হান দারোগার নাম্বারটা দে তো ফোন করি।'

যাদের নিয়ে ছিলো অনেক আলোচনা সেই এনজিওদের অবস্থা বেশ কৌতুহলোদ্দীপক প্রায় সবাই ফিরে এসেছে নিজ নিজ প্রোগ্রাম নিয়ে, তোড়জোড় চলছে আবার লেট্রিন তৈরির, ড্রেন করার। অন্যদিকে স্কুলগুলোতে ছাত্রছাত্রী ভরা, আর স্বাস্থ্যসেবা পেতে শুরু করেছে লোকজন। কিছু ক্ষুদ্র ঋণের কার্যক্রম চালানো এনজিওগুলোর মাঠকর্মীদের সাথে আমার কথা হয়, 'রিস্ক আছে' ধরনের মন্তব্য করে উনারা বলেন, একবার প্রতিষ্ঠানের এতগুলো টাকা নষ্ট হয়েছে, আবার লোন দিলে কখন কি হয়ে যায় তার তো ঠিক নেই, বস্তি যদি আবার ভাঙ্গে।' জানতে চেয়েছিলাম আবার কার্যক্রম শুরু করলে ঋণ হিসাবে দেওয়া টাকাগুলো কি উঠে আসবে? 'ঐগুলা তো ফি সাবিলিল্লাহ হিসাবে গেছে... আর আসে নাকি!'- জানায় তাঁরা।

মূল আগ্রহের জায়গা অর্থাৎ 'আবার কিভাবে বস্তি স্থাপিত হলো?'- এ প্রশ্নের উত্তর খুঁজতে গিয়ে দেখি অন্যেরা সবাই এমন কি এমএ জামান সাহেব পর্যন্ত হারিয়ে গেছে। ছোট বাচ্চা থেকে শুরু করে নারী, পুরুষ সবাই পুনরায় বস্তি স্থাপনের পুরো কৃতিত্ব দিতে চায় ড. কামাল হোসেনকে (প্রখ্যাত আইনজীবী ও রাজনীতিবিদ)। 'ড. কামাল হোসেন হাইকোর্টে মামলা করে স্টে অর্ডার করে দিছে। এখন সরকার, এইচবিআরআই, পুলিশ, কমিশনার কেউ আর উচ্ছেদ করতে পারবে না। তার ডাকে আমরা সবসময় সাড়া দিই, মিছিল, মিটিং করি।' আর কারো ভূমিকা নেই? জানার চেষ্টা করি। 'আছে, সারা হোসেনের (কামাল হোসেন এর কন্যা)।' তবে ঐ স্টে অর্ডার ছাড়া কোনভাবেই বস্তি আবার স্থাপিত হতো না বলে বেশিরভাগ বস্তিবাসী মনে করেন এবং কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করেন কামাল হোসেন ও সারা হোসেনের প্রতি।

প্রকৃত বাস্তবতা জানার জন্য সারা হোসেনের সাথে কথা বলি। বুকের মধ্যে কামাল হোসেন আর ভোটের বাক্সে স্থানীয় এমপি - কল্যাণপুর বস্তির সাথে কামাল হোসেনের হৃদ্যতা দীর্ঘদিনের। প্রথমত, আশির দশকে এই বস্তি উচ্ছেদের যাবতীয় প্রস্তুতি যখন সরকার সম্পন্ন করে তখন বস্তিবাসী এবং এনজিওরা যে মিলিত প্রতিরোধ গড়ে তোলে সেটা সফলতার মুখ দেখে কামাল হোসেনের হাত ধরে। বস্তির লোকজন তখন থেকেই তাকে বেশ ভালোভাবে চেনে। এরপর আসে ১৯৯৬-এর নির্বাচন যখন তিনি সংসদ নির্বাচন করেন এই এলাকা থেকে। আরেকবার এই বস্তিতে তিনি ভোটের জন্য আসেন, বস্তিবাসীদের সাথে পরিচয়ের ভিত্তি আরো দৃঢ় হয়। বিভিন্ন সময়ে বস্তি উচ্ছেদের বিরুদ্ধে জনস্বার্থ মামলাসহ আরো কিছু কারণে 'গরিবের জন্য কামাল হোসেন' এমন একটা ইমেজ ঢাকা শহরে ছিলো। ফলে কল্যাণপুর বস্তির লোকজন বিভিন্নভাবে চেষ্টা করে যখন কিছু করতে পারে না তখন অতীত অভিজ্ঞতার আলোকে কামাল হোসেনের কাছে আসে সাহায্যের জন্য। ইতিমধ্যে আইন সহায়তা কেন্দ্র (আসক) এবং ব্লাস্ট নামে দুইটি এনজিও এই বস্তির লোকজনকে সংগঠিত করে আইনের মাধ্যমে কিছু করা যায় কিনা তা দেখার জন্য। বস্তিবাসীদের যোগাযোগ এবং এনজিও দুইটির কার্যক্রমের কারণে কামাল হোসেন একদিন বস্তিতে আসেন প্রকৃত অবস্থা জানার জন্য। তিনি যখন সেখানে মিটিং করে এবং ছবি তুলে গাড়িতে উঠছিলেন ফেরার জন্য তখন বস্তির এক 'কোর্ট পরা, হাতে মোবাইলওয়ালা

নেতা' দৌড়ে এসে কিছু কাগজ দেখান তাকে। সারা হোসেনের কথা অনুযায়ী ঐ কাগজগুলো (ভূমি-মন্ত্রণালয়ের বস্তিবাসীদের পুনর্বাসন সংক্রান্ত কাগজ যেটায় প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়ের অনুমোদন ছিলো) মামলা চালানোর জন্য খুবই গুরুত্বপূর্ণ। সরকারি এই কাগজগুলো সংগ্রহ করা বেশ কঠিন ছিলো, এমনকি একজন আইনজীবীর পক্ষেও।

এরপর পাশাপাশি তিনটি ঘটনা চলতে থাকে, একদিকে দলীয় পরিচয়ের উর্দ্ধে থেকে বস্তির সকল সংগঠনগুলো এক প্লাটফর্মে এসে দাঁড়ায় বস্তি রক্ষার জন্য যেখানে বিএনপি, আওয়ামী লীগ, বাম দল বলে কোন ভাগ ছিলো না। অন্যদিকে কামাল হোসেন হাইকোর্টে ঐ কাগজগুলোর সহায়তায় জনস্বার্থ রক্ষা মামলা করেন। পাশাপাশি চলতে থাকে 'আসক' এবং 'ব্লাস্ট' এর যোগাযোগ রক্ষামূলক কাজগুলো, যেমন বস্তিবাসীদের সংগঠিত করা, মামলার খোঁজখবর রাখা, ইত্যাদি। ফলাফল দাঁড়ায়–

- কোর্ট থেকে বলা হয় - বস্তিবাসীদের জন্য গাজীপুরে যে পুনর্বাসন প্রক্রিয়া প্রক্রিয়াধীন রয়েছে সেখানে কল্যাণপুর বস্তিবাসীদেরকে পুনর্বাসন করার কথা। পাল্টা যুক্তি দেওয়া হয় - পুনর্বাসন প্রক্রিয়া প্রক্রিয়াধীন অবস্থায় থাকাকালীন, কেন বস্তিবাসীরা রাস্তায় থাকবে?
- ৮টি ইউনিটের মধ্যে ১ ও ৫ নং ইউনিট দুইটি যে উচ্ছেদ হয়নি সেটা গবেষণাপত্রে উল্লেখ আছে। হাইকোর্ট থেকে এই ২টি ইউনিট নতুন করে উচ্ছেদের বিরুদ্ধে নিষেধাজ্ঞা জারি করা হয়। আর যেহেতু বাকি অংশগুলো সরকারি জায়গা থেকে উচ্ছেদ হয়েই গেছে, সেখানে হাইকোর্ট কোন সিদ্ধান্ত দেয় না।

পুরো প্রক্রিয়ার সাথে সক্রিয়ভাবে যুক্ত থাকার কারণে সারা হোসেন নিজের অভিজ্ঞতা থেকে কিছু মতামত দেন যেটা বেশ কৌতূহলোদ্দীপক –

(১) পুরো প্রক্রিয়ায় 'ব্লাস্ট' এবং 'আসক' এর অনেক অবদান। তাদের ছাড়া এ অবস্থায় আসা সম্ভব হতো না। এখানে কামাল হোসেনের একক কোন অবদান নেই, তবে তিনি বস্তির জন্য অনেক কাজ করেছেন। 'কামাল হোসেন তো এখন বস্তিবাসীদের কাছে হিরো' - আমার এ মন্তব্যের জবাবে তিনি উপরের কথার সাথে আরো যোগ করেন, 'বস্তিবাসীরা কামাল হোসেনকে ভালবাসে, সম্মান করে ঠিকই কিন্তু ভোট দিতে পারে না। ছিয়ানব্বইয়ের নির্বাচনের অভিজ্ঞতার আলোকে তিনি বলেন তারা ইচ্ছা করলেও ভোট দিতে পারে না, কারণ এমন পরিস্থিতির মধ্যে তারা বসবাস করে যে কাকে ভোট দিলো সেটা ভোটের পরে বোঝা যায় এবং লোকাল এমপিকে ভোট না দিলে পরে তাদের পক্ষে ঐ জায়গায় থাকা কষ্টকর হয়ে যায়।

(২) বিদিশা-এরশাদের ঘটনা কিংবা গণগ্রেফতার নিয়ে মিডিয়া যতটা আগ্রহী ঠিক ততোটাই অনাগ্রহী এই বস্তিবাসীদের নিয়ে। ফলে ইস্যু হিসাবে এটা দ্রুত হারিয়ে যায়। মামলা চলাকালীন সময়ে এই বিষয়ে পত্রিকায় রিপোর্ট করাতে গিয়ে তিনি ব্যর্থ হয়েছেন। পাশাপাশি এনজিওদের ভূমিকা নিয়েও তার অভিযোগ রয়েছে। তার অভিজ্ঞতায় দেখেছেন নব্বই দশকের মাঝামাঝি পর্যন্ত এনজিওগুলো এধরনের সমস্যার সময়ে পাশে দাঁড়িয়েছে। কিন্তু সাম্প্রতিক সময়ে রাষ্ট্রীয় বা এনজিও নীতিমালাই হোক অথবা অন্যকোন কারণেই হোক এনজিওরা বর্তমানে নিরাপদ দূরত্বে অবস্থান করছে, যেটা বেশ সমস্যার সৃষ্টি করছে। যেমন সিইউপি নামক এনজিওটির নীতি হচ্ছে সবসময়ই বস্তিবাসীদের পক্ষে থাকা কিন্তু এবার তারা কিছুটা নির্লিপ্ত থেকেছে।

(৩) বর্তমানে কোর্টে বিষয়টি নিয়ে কোন শুনানি হচ্ছে না কিন্তু যে কোন সময় সরকার চাইলেই এর শুনানি হবে। এধরনের ঘটনায় মূল সমস্যা হলো বস্তিবাসীরা যখন গৃহহীন অবস্থায় ছিলো তখন তারা খুবই দৌড়াদৌড়ি করতো, সবসময় যোগাযোগ রাখতো। কিন্তু বর্তমানে তারা কোনমতে থাকার জায়গা পেয়েছে এখন আর সেই উদ্যোগ নেই। শেষ মুহূর্তে কেস হিয়ারিং-এর সময় 'হাউকাউ' লাগবে। অর্থাৎ বস্তির লোকজন কোনোমতে থাকতে পেরেই খুশি। এখন আর মামলার খোঁজখবর নেয় না কিংবা কোন প্রকার কর্মসূচিও দেয় না।

বস্তিবাসীরা নতুন করে বস্তি স্থাপনকে 'পলিথিনের নিচে টিন' হিসাবে বর্ণনা করেন। তারা বলেন, 'কামাল হোসেন হাইকোর্টের থেইক্যা স্টে অর্ডার আইন্যা দিছে আর ঘর উঠাইতে কইছে, পরে লোকজন আস্তে আস্তে টিন কিইন্যা পলিথিনের নিচে টিন দিয়া ঘর উঠাইছে।' উনারা নিশ্চিত যে, 'কামাল হোসেন থাকতে আর তাদেরকে কেউ উঠায়ে দিতে পারবে না।' 'স্থানীয় আনসার আর মহল্লাবাসীদের সাথে কথা বলেছিলাম, তারা আবার আগের মতো 'বস্তিতে ভালো লোক থাকে নাকি,' সব দু'নম্বর' এ ধরনের মন্তব্য করেন। হয়ত এইভাবে বেশ কিছুদিন টিকে থাকবে এই বস্তি। ভোটের আগে আবার নেতারা এসে প্রতিশ্রুতি দিবে, ভোট পাবে, তারপর একদিন আবার সুযোগ মতো বস্তি ভাঙ্গবে। বস্তিবাসীরা হয়তো আবারও চেষ্টা করবে টিকে থাকার। সফল না হলে হঠাৎ এই স্থানে উঠে যাবে সরকারি বা বেসরকারি উঁচু কোন দালান।

তথ্যপঞ্জী

Begum NN. Low income families of metropolitan Dhaka. Dhaka: Centre for Family Services, 1994.

Hider SJ. Strategies of development of adolescent and youth in urban slums. *Bangladesh Observer,* 27 Jan 2002.

Islam N. The urban poor in Bangladesh. Dhaka: Center for urban studies, University of Dhaka, 1996.

Jane PA. Poverty and vulnerability in Dhaka slums: the urban livelihoods study. USA: Ashgate Publishing Company, 2003.

Khan AU. Health profile of the urban poor in Bangladesh. *CUS Bulletin Urbanizational Dev* 1995 Jun and Dec; 28 and 29:2-3.

Majumder PP, Mahmud S, Rita A. *The squatters of Dhaka city: dynamism in the life of Agargaon squatters.* Dhaka: University Press Ltd., 1996.

আমিন, মো. শহীদুল। নিম্নবিত্ত আবাসন একটি অধিকারের উচ্ছেদ। *সাপ্তাহিক বিচিত্রা*, ২ মার্চ ১৯৯০।

আহমেদ, আবদাল। নিম্নবিত্তরা থাকবে কোথায়? *সাপ্তাহিক বিচিত্রা*, ২ মার্চ ১৯৯০।

আলী, মাসুদ। বস্তিবাসীর অর্থনীতি। *কৌটিল্য কথা- ৫*।

ইসলাম, মো. নুরুল এবং ইসলাম, মো. শরীফুল। বাংলাদেশের নগর দারিদ্র্য: সাম্প্রতিক গতি-প্রকৃতি। *উন্নয়ন বিতর্ক: বাংলাদেশের নগর দারিদ্র্য*। ডিসেম্বর ১৯৯৬-জানুয়ারি ১৯৯৭।

উমর, বদরুদ্দীন। বস্তি উচ্ছেদ এবং সরকারের গৃহায়ন নীতি ও পরিকল্পনা। *যুগান্তর*, ২৯ আগস্ট ২০০১।

একনজরে বস্তি চিত্র। *বিচিত্রা*, ২ মার্চ ১৯৯০।

করিম, মো. রফিউল। নগরীয় স্বত্বহীন বসতি, স্বাস্থ্য সমস্যা ও তার ব্যাপকতা সমাধানে কতিপয় দিকনির্দেশনামূলক সুপারিশ। *J Local Gov*, জানুয়ারি-জুন ১৯৯৩:৬২-৭৫।

খান, ম আহসান। আশ্রয়হীনদের পুনর্বাসনের ব্যবস্থা না করে বস্তি উচ্ছেদ অনৈতিক। *আজকের কাগজ*, ১৭ আগস্ট ২০০২।

নগর গবেষণা কেন্দ্র, স্লামস এন্ড স্কোয়াটার্স ইন ঢাকা, ১৯৮৮।

মেনন, রাশেদ খান। বস্তি উচ্ছেদ: সেই পুরাতন কথা। *প্রথম আলো*, ১৩ আগস্ট ২০০২।

মজুমদার, প্রতিমা পাল। শহুরে দারিদ্র্য, বস্তির জীবন ও কিছু 'মিথ'। *বিচিত্রা*, ২ মার্চ ১৯৯০।

রশিদুজ্জামান, এএম। নগরে বস্তি কেন বাড়ছে? *সংবাদ*, ১২ জানুয়ারি ১৯৯৭।

সেন, নির্মল। বস্তি উচ্ছেদ: পুলিশের ভাষা আর মুনার অভিযোগ। *জনকণ্ঠ*, ১এপ্রিল ২০০২।

সাহা, প্রদীপ। বস্তি পরিবেশ উন্নয়নের অন্তরায়: সভ্যতার গোপন ক্ষত। *যোগাযোগ*, ফ্রেব্রুয়ারি ১৯৯৭।

হোসেন, মোকাম্মেল। ঢাকার বস্তি জীবন: অসহায় মানবতার নীরব কান্না। *উন্নয়ন বিতর্ক: ঢাকার বস্তি জীবন।* সেপ্টেম্বর ১৯৯৫।

হক, মো. আমিনুল। বস্তি সমস্যা নিয়ে কিছু কথা। *সংবাদ*, ১০মার্চ ১৯৯৭।